Contents

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	৬
১.	আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা	৭
২.	আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুকালীন অছিয়ত	৮
৩.	আবুবকর (রাঃ)-এর গোপন আমল	৯
৪.	নীলনদের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর পত্র	১০
৫.	রাষ্ট্রপ্রধানের জবাবদিহিতা	১১
৬.	আমানতদারিতার অনন্য দৃষ্টান্ত	১২
৭.	পাত্রী নির্বাচন	১২
৮.	ন্যায়পরায়ণ শাসক	১৩
৯.	কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার	১৪
১০.	হাক্কুল ইবাদ রক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত	১৭
১১.	ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সাদাসিধে জীবনযাপন	১৭
১২.	আলী বিন হুসায়েন (রহঃ)-এর গোপন আমল	১৮
১৩.	ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ)-এর গোপন আমল	১৯
১৪.	কুরআনের ইলাহী সংরক্ষণ ও একজন ইহুদী পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণ	১৯
১৫.	বীর সেনানী মুহাম্মাদ বিন কাসিম	২১
১৬.	অমুসলিমের অধিকার রক্ষায় বাদশাহ আওরঙ্গযেব	২২
১৭.	সম্রাট বাবরের মহত্ত্ব	২৩
১৮.	তাক্বওয়ার পুরস্কার	২৪
১৯.	মৃত্যুর দুয়ারে ত্যাগের মহিমা	২৮
২০.	শত্রুর জিঘাংসা	৩০
২১.	বুদ্ধিমান বালক	৩০
২২.	মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও জনৈক ভিক্ষুক	৩১
২৩.	ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও ছূফীদের গল্প	৩১
২৪.	ইহসান ইলাহী যহীর ও ভণ্ড ছূফীর কেরামতি	৩৩
২৫.	মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও জনৈক পীর ছাহেব	৩৪
২৬.	পীরভক্তি	৩৫
২৭.	সম্পদের মোহ	৩৭
২৮.	তিন লোভী ডাকাত	৩৯

Contents

২৯. জনৈক মহিলা ও সোনার ডিম ৪০
৩০. সবল ও দুর্বল বিড়াল ৪০
৩১. লোভী শিয়াল ও ঢোল ৪১
৩২. শিকারী ও বাঘ ৪১
৩৩. লোভী বণিক ৪২
৩৪. নেকড়ে ও খরগোশের শান্তিচুক্তি ৪৪
৩৫. অকৃতজ্ঞের পরিণাম ৪৫
৩৬. পশুর কৃতজ্ঞতাবোধ ৪৭
৩৭. অপূর্ব প্রতিদান ৪৮
৩৮. বুদ্ধিমান বিচারক ৫১
৩৯. কাযীর বিচার ৫৫
৪০. মিথ্যা সাক্ষী ৫৬
৪১. বাদশাহ আমানুল্লাহ্‌র বিচক্ষণতা ৫৯
৪২. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন ৬০
৪৩. সময় মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয় ৬২
৪৪. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ৬৫
৪৫. ষড়যন্ত্রের পরিণতি ৬৭
৪৬. বক ও কাঁকড়া ৭১
৪৭. বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ও ঐক্যের শক্তি ৭২
৪৮. কূটকৌশলের পরিণাম ৭৪
৪৯. আদর্শ পিতা-মাতার যোগ্য সন্তান ৭৭
৫০. হাতেম তাঈর মহত্ত্ব ৭৯
৫১. গণ্য-মান্য-নগণ্য-জঘন্য ৮০
৫২. উচিত জবাব ৮৪
৫৩. সিংহ ও ইঁদুর ৮৬
৫৪. শিকারী ও ঘুঘু ৮৬
৫৫. যোগ্য পাত্র নির্বাচন ৮৭
৫৬. একজন পরোপকারী অফিস প্রধান ৯০
৫৭. আল্লাহ যা করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্য করেন ৯২
৫৮. প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায় ৯৪
৫৯. গুপ্তধন ৯৮

Contents

৬০. কৃপণ ও নিঃস্ব ১০১
৬১. পান্থশালা ১০২
৬২. খাদীজার পর্দা ১০৩
৬৩. পরিণামদর্শী ক্রীতদাস ১০৬
৬৪. মানুষকে সন্তুষ্ট করার পরিণতি ১০৭
৬৫. সাড়ে তিন হাত মাটি ১০৯
৬৬. কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতা ১১১
৬৭. তিন বোকার কাণ্ড ১১১
৬৮. জীবিকা অর্জনের চেষ্টা ১১১
৬৯. চাষী ও ইঁদুর ১১২
৭০. বানর ও কাঠমিস্ত্রী ১১৩
৭১. খরগোশ ও শিয়াল ১১৩
৭২. মাছের বুদ্ধিমত্তা ১১৪
৭৩. কচ্ছপ ও হাঁস ১১৫
৭৪. বাদশাহ ও তার চামচা ১১৬
৭৫. মূর্খ চিকিৎসক ১১৬
৭৬. লোভী শিকারী ও বাঘ ১১৭
৭৭. লোভী বিড়াল ১১৮
৭৮. বিপদগ্রস্তকে সর্বাগ্রে সাহায্য করা ১১৮
৭৯. সময়ের কাজ সময়ে করা ১১৯
৮০. কুরআন-হাদীছের বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয় ১১৯
৮১. ঈমান হরণ ১২১
৮২. একজন কৃষকের আত্মবিশ্বাস ১২৪
৮৩. নিঃসঙ্গ ১২৫
৮৪. দুঃস্বপ্নের কালো টাকা ১২৭
৮৫. নাছিরুদ্দীন হোজা ও এক দুঃখবিলাসী ১৩০
৮৬. অতি চালাকের গলায় দড়ি ১৩১
৮৭. জীবনের বিনিময়ে সতীত্ব রক্ষা ১৩৩
৮৮. ইনছাফপ্রিয় বাদশাহ ১৩৬
৮৯. মুসলমানদের বিজয়ের গূঢ় রহস্য ১৩৯
৯০. ক্বিয়ামতের সামান্য দৃশ্য ১৪০

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে **'গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান'** বইটি আলোর মুখ দেখল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে আমাদের প্রকাশিত **'হাদীছের গল্প'** বইটি বাজারে আসার পর পাঠকের বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ শিশু-কিশোরদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বিষয়বস্তুর কারণে সর্বমহলের পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। একই ধারায় আমরা 'গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান' বইটি প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। মাসিক **আত-তাহরীকে** প্রকাশিত গল্পগুলি সহ আরো কিছু গল্প এই বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষণীয় এ গল্পগুলিতে শিশু-কিশোরসহ সর্বশ্রেণীর পাঠকই উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি গল্পের শেষে শিক্ষণীয় বিষয় সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যাতে গল্পের মৌলিক শিক্ষাটি অনুধাবন করতে পাঠকের কষ্ট না করতে হয়। সাথে সাথে পাঠকের নৈতিক চরিত্র ও সুস্থ মননশীলতা বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। বলা বাহুল্য গল্প বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য এটাই।

আর যেসব সম্মানিত লেখকের চমৎকার গল্পগুলি এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সঙ্গত কারণেই তাদের নামগুলি প্রকাশিত হ'ল না। তবে তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। আমরা দো'আ করি- তাঁদের পরিশ্রমটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করে নিন এবং তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও দো'আ রইল।

বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর জন্য সহৃদয় পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেয়া হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র খিদমতটুকু কবুল করুন- আমীন!

পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

১. আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা

(১) খলীফা আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত সেনাবাহিনী তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মদীনায় ফিরে এসেছে। এক্ষণে তাদের রাজধানী রক্ষার জন্য মদীনায় রাখা হবে, না পুনরায় প্রেরণ করা হবে- এ নিয়ে শীর্ষস্থানীয় ছাহাবীগণের মধ্যে আলোচনা হ'ল। অধিকাংশের পরামর্শ হ'ল, এ মুহূর্তে রাজধানী মদীনাকে রক্ষা করাই হবে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাছাড়া সেনাপতি পরিবর্তন করাও আবশ্যক। কেননা সে হ'ল বয়সে তরুণ এবং গোলামের পুত্র উসামা বিন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ)। আনছার ও মুহাজির সেনারা তাঁর নেতৃত্ব মানতে চাইবে না। খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, 'মদীনার রক্ষাকর্তা আল্লাহ। যুদ্ধে বিজয় দানের মালিকও আল্লাহ। আর ইসলামে সাদা-কালোর কোন ভেদাভেদ নেই। অতএব মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যার মাথায় জিহাদের পাগড়ী বেঁধে যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করেছিলেন, আমি সে পাগড়ী খুলে নিতে পারব না'। অতঃপর আল্লাহ্র নামে তিনি সেনাবাহিনীকে খৃষ্টান পরাশক্তির বিরুদ্ধে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধ শেষে যথারীতি তারা বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে এল। চারিদিকে শত্রু-মিত্র সবার মধ্যে নতুন মাদানী রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রদ্ধার আসন দৃঢ় হ'ল *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৪২০)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর যাকাত জমা দিয়ে তাঁর দো'আ পাবার সুযোগ নেই- এই অজুহাতে একদল লোক নতুন খলীফার নিকটে যাকাত জমা করতে অস্বীকার করল। শূরার বৈঠক বসল। খলীফা আবুবকর (রাঃ) ওদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু শূরা দ্বিমত পোষণ করল। এমনকি ওমর (রাঃ) বললেন, হে খলীফা! তারা যে কলেমাগো মুসলমান। আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন? খলীফা বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি ছালাত

ও যাকাতের দু'টি ফরয (একটি হাক্কুল্লাহ অন্যটি হাক্কুল ইবাদ)-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে? আল্লাহ্র কসম! রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে যাকাত হিসাবে জমাকৃত একটি বকরীর দড়িও যদি কেউ আজকে দিতে অস্বীকার করে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব'। ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দেখলাম আল্লাহ আবুবকরের বক্ষকে যুদ্ধের জন্য সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। ফলে আমি বুঝতে পারলাম তিনি হক-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত আছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০)*। এই যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতে আর কেউ কোন ফরয বিধানকে হালকা করে দেখার সাহস পায়নি এবং এভাবে হাক্কুল ইবাদ রক্ষার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত মযবুত হ'ল। গরীবদের অধিকার রক্ষা পেল।

শিক্ষা : আবুবকর (রাঃ)-এর অপূর্ব ঈমানী দৃঢ়তার স্বাক্ষর উপরোক্ত ঘটনা দু'টি। এর মাধ্যমে তিনি হাক্কুল ইবাদ কঠোরভাবে রক্ষা করলেন। সাথে সাথে ইসলামের কোন ফরয ইবাদতকে হালকা করে দেখার যে কোন অবকাশ নেই- সেটিও জনগণকে বুঝিয়ে দিলেন।

২. আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুকালীন অছিয়ত

ইসলামের ১ম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ'লে তিনি সূরা ক্বাফ-এর ১৯নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ('মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে; যা থেকে তুমি টালবাহানা করে থাক')। অতঃপর তিনি স্বীয় কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমার পরিহিত দু'টি কাপড় ধুয়ে তা দিয়ে আমাকে কাফন পরিয়ো। কেননা মৃত ব্যক্তির চাইতে জীবিত ব্যক্তিই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৪৪৫১)*। অতঃপর তিনি পরবর্তী খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে অছিয়ত করেন এই মর্মে যে, 'নিশ্চয়ই রাত্রির জন্য আল্লাহ এমন কিছু হক নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা তিনি দিবসে কবুল করেন না। আবার দিবসের জন্য এমন কিছু হক নির্ধারণ করেছেন, যা রাতে কবুল করেন না। কোন নফল ইবাদত কবুল করা হয় না, যতক্ষণ না ফরযটি আদায় করা হয়। নিশ্চয়ই আখেরাতে মীযানের পাল্লা হালকা হবে দুনিয়ার বুকে বাতিলকে অনুসরণ করা এবং নিজের উপর তা হালকা মনে করার কারণে। অনুরূপভাবে আখেরাতে মীযানের পাল্লা ভারী হবে দুনিয়াতে

হক অনুসরণ করা এবং তাদের উপর তা ভারী হওয়ার কারণে’ *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হা/৩৫৫৭৪)*।

শিক্ষা : রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব পালনকারীর জন্য অলসতা ও বিলাসিতার কোন সুযোগ নেই। তাকে কোন অবস্থাতেই বাতিলের সাথে আপোষ করা চলবে না। বরং যেকোন মূল্যে সর্বাবস্থায় হক তথা আল্লাহ প্রেরিত সত্যকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কেননা দুনিয়াতে সকল কাজের উদ্দেশ্য হবে আখেরাতে মীযানের পাল্লা ভারী করা।

৩. আবুবকর (রাঃ)-এর গোপন আমল

ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করে মরুভূমির দিকে হাঁটাহাঁটি করতেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর শহরে ফিরে আসতেন। ওমর (রাঃ) তাকে প্রতিদিন শহরের বাইরে ঘোরাফিরা করতে দেখে কৌতূহল বোধ করলেন। তাই একদিন ফজরের ছালাতের পর আবুবকর (রাঃ) যখন বের হ’লেন, তখন তিনি পায়ে পায়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে একটি পুরাতন তাঁবুতে প্রবেশ করলে ওমর (রাঃ) একটি টিলার পিছনে লুকিয়ে থাকলেন সন্তর্পণে। কিছুক্ষণ পর আবুবকর (রাঃ) সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আবার শহরের পথ ধরলেন। এদিকে ওমর (রাঃ) টিলার আড়াল থেকে বের হলেন এবং উক্ত তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এমন একজন অন্ধ দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার কয়েকটি শিশু সন্তান রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান, তোমার নিকটে কে আসে? মহিলা বলল, আমি তাকে চিনি না। তিনি একজন মুসলিম। প্রতিদিন সকালে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের গৃহ পরিষ্কার করেন। তারপর রুটি তৈরীর জন্য আটা পিষে এবং গৃহপালিত পশুগুলির দুগ্ধ দোহন করে চলে যান। একথা শুনে ওমর (রাঃ) বিস্ময়াভিভূতভাবে বেরিয়ে আসলেন এবং স্বগতোক্তি করলেন, لَقَدْ أَتْعَبْتَ الْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِكَ يَـــا أَبَـــا بَكَـــرٍ ‘হে আবুবকর! পরবর্তী খলীফাদের উপর তুমি কত কষ্টই না চাপিয়ে দিলে’! *(তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৩০/৩২২)*।

শিক্ষা : অসহায় গরীব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদেরকে সহযোগিতা করা রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য।

৪. নীলনদের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর পত্র

২০ হিজরী সনে দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে বিখ্যাত ছাহাবী আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম মিসর বিজিত হয়। মিসরে তখন প্রবল খরা। নীলনদ পানি শূন্য হয়ে পড়েছে। সেনাপতি আমরের নিকট সেখানকার অধিবাসীরা অভিযোগ করে বলল, হে আমীর! নীলনদ তো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন ছাড়া প্রবাহিত হয় না। তিনি বললেন, সেটা কি? তারা বলল, এ মাসের ১৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা কোন এক সুন্দরী যুবতীকে নির্বাচন করব। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে রাযী করিয়ে তাকে সুন্দরতম অলংকারাদি ও উত্তম পোষাক পরিধান করানোর পর নীলনদে নিক্ষেপ করব।

আমর ইবনুল ‘আছ তাদেরকে বললেন, ইসলামে এ ধরনের কাজের কোন অনুমোদন নেই। কেননা ইসলাম প্রাচীন সব জাহেলী রীতি-নীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতঃপর তারা পর পর তিন মাস পানির অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। কিন্তু নীলনদের পানি বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীরা দেশত্যাগের কথা চিন্তা করতে লাগল। এ দুর্যোগময় অবস্থা দৃষ্টে সেনাপতি আমর ইবনুল আছ (রাঃ) খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পত্র প্রেরণ করলেন। উত্তরে ওমর (রাঃ) লিখলেন, হে আমর! তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। আমি এ পত্রের মাঝে একটি পৃষ্ঠা প্রেরণ করলাম। এটা নীলনদে নিক্ষেপ করবে।’ ওমরের পত্র যখন আমরের নিকটে পৌছাল, তখন তিনি পত্রটি খুলে দেখলেন সেখানে এ বাক্যগুলি লেখা রয়েছে– من عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ إِلَى نيل مصر أما بعد فَإِن كنت تجرى من قبلك فَلاَ تجر وَإِن كَانَ الله الْوَاحِد القهار هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُجْرِيَكَ– ‘আমীরুল মুমিনীন ওমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের প্রতি। যদি তুমি নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তবে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি একক সত্তা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করান, তবে আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন’।

অতঃপর আমর (রাঃ) পত্রটি নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। পর দিন শনিবার সকালে মিসরবাসী দেখল, আল্লাহ তা'আলা এক রাতে নীলনদের পানিকে **১৬** গজ উচ্চতায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তারপর থেকে আজও পর্যন্ত নীলনদ প্রবাহিতই রয়েছে। কখনো বিশুষ্ক হয়নি *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১০০; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৪৪/৩৩৭; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা ২/৩২৬)*।

শিক্ষা : আল্লাহ্‌র হুকুমেই পৃথিবীর সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত গাছের একটা পাতাও নড়ে না। অতএব যেকোন দুর্যোগে কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। কোন জাহেলী ও শিরকী পন্থার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

৫. রাষ্ট্রপ্রধানের জবাবদিহিতা

মুহাম্মাদ বিন ওবায়দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে কিছু কাপড় আসলে তিনি সেগুলি হকদারগণের মাঝে বণ্টন করে দেন। এতে আমাদের প্রত্যেকে একটি করে কাপড় পেল। কিন্তু তিনি নিজে দু'টি কাপড় দিয়ে তৈরী একটি পোষাক পরিধান করে খুৎবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করলেন। কিন্তু শ্রোতাদের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি আমার কথা শ্রবণ করছ না? এমতাবস্থায় বিখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জি না, আমরা শ্রবণ করব না। ওমর (রাঃ) বললেন, কেন হে আবু আব্দুল্লাহ? তিনি বললেন, আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন। অথচ আপনি পরিধান করেছেন (দুই কাপড়ের) বড় পোষাক! ওমর (রাঃ) বললেন, ব্যস্ত হয়ো না হে আবু আব্দুল্লাহ! অতঃপর তিনি ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর দিকে ইশারা করলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে জিজ্ঞেস করছি, আমার পোষাকে যে অতিরিক্ত কাপড় রয়েছে, সেটা কি তোমার নয়? আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বললেন, জি, আমার। অতঃপর সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, এখন আপনি বক্তব্য শুরু করুন, আমরা শ্রবণ করব *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১২৩; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/২০৩)*।

শিক্ষা : রাষ্ট্রপ্রধান জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন। তাঁকে পরকালে যেমন আল্লাহ্র কাছে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি দুনিয়াতেও তিনি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৬. আমানতদারিতার অনন্য দৃষ্টান্ত

ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৬ হিজরীতে মুসলিম সৈন্যদল মাদায়েন জয় করেছে। গণীমতের মাল জমা হচ্ছে। এমন সময় এক ব্যক্তি মহামূল্যবান ধন-রত্ন নিয়ে এল। জমাকারী বললেন, এমন মূল্যবান সম্পদ তো আমরা ইতিপূর্বে দেখিনি। তুমি এখান থেকে নিজের জন্য কিছু রেখে দাওনি তো ভাই? লোকটি বলল, والله لولا الله ما آتيتكم به 'আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত, তাহ'লে আমি কখনোই এ সম্পদ আপনাদের কাছে নিয়ে আসতাম না'। সবাই তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি অস্বীকার করে বলেন, যদি আমি পরিচয় দেই, তাহ'লে আপনারা আমার প্রশংসা করবেন। অথচ আমি কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকটেই প্রতিদান কামনা করি। এরপর তিনি চলে গেলেন। তখন তার পিছনে একজন লোককে পাঠানো হ'ল এবং জানা গেল যে, তিনি হলেন, আমের বিন আবদে ক্বায়েস *(তারীখুত ত্বাবারী ২/৪৬৫)*।

শিক্ষা : আমানতদারিতা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ।

৭. পাত্রী নির্বাচন

ওমর (রাঃ) জনসাধারণের সঠিক অবস্থা জানার জন্য রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। এক রাতে একটি ছোট্ট কুটিরের সামনে এলে তিনি বাড়ীর ভিতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, 'দুধের সাথে পানি মিশাও। ভোর হয়ে এল'। মেয়েটি উত্তর দিল, 'না মা, ওমর (রাঃ) দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন'।

মা বললেন, 'ওমর দেখতে পেলে তো'? মেয়ে বলল, 'আমি প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব, আর গোপনে তাঁর অবাধ্যতা করব? আল্লাহ্র কসম! এটা

আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলল, ওমর (রাঃ) হয়ত আমাদেরকে দেখছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভু তো আমাদেরকে দেখছেন! গোপনে সব শুনে ওমর (রাঃ) বাড়ীটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। পরে তার ছেলে আছেমের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দিলেন। তার গর্ভে দু'টি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, যাদের একজনের গর্ভে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর জন্ম হয়েছিল *(তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৭০/২৫৩)*।

শিক্ষা : পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল গুণের উপর দ্বীনদারী ও আল্লাহভীরুতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৮. ন্যায়পরায়ণ শাসক

ওমর ফারূক (রাঃ) কূফায় একজন গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। এমনিতেই সমস্ত ছাহাবা ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে গভর্ণর আরো একধাপ অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর চোখে বিচারাদি সহ সকল বিষয়েই ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উঁচু-নীচু এবং ছোট-বড় সমান ছিল। কোন ব্যাপারে কারো কোন তোয়াক্কা না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারাদি ও শাসন কাজ চালাতেন। এতে করে এক শ্রেণীর হোমড়া-চোমড়া ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করল। তারা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারল, গভর্ণর ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মদীনা যাবেন। এই সুযোগে চাঁদা তুলে দুই হাযার দীনার জমা করে তাদের কয়েকজন মদীনা যাত্রা করল। সেখানে পৌঁছে গভর্ণর যখন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য গেলেন, তখন তারাও সেখানে হাযির হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? কি চান? তারা বলল, আমরা কূফার নাগরিক এবং সেখান থেকেই এসেছি। তেমন কোন কাজ নেই। বেড়াতে এসেছি এবং সামান্য একটি ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে আসলাম। তিনি বললেন, কোন্ ব্যাপারে? তারা বলল, আপনার এই অলী (গভর্ণর) বায়তুল মালের সম্পদ আত্মসাৎ করে আমাদের নিকট এই দুই হাযার দীনার জমা রেখেছিল। ওটা আপনাকে ফেরৎ দিতে এলাম। ফারূকে আযম (রাঃ) গভর্ণরকে প্রশ্ন করলেন, তাদের অভিযোগ কি সত্য? তিনি বললেন, না তারা মিথ্যা বলেছে। আমি ওদের নিকট চার হাযার দীনার জমা

রেখেছিলাম। কিন্তু তারা দুই হাযার আত্মসাৎ করে বাকী দুই হাযার জমা দিতে এসেছে। ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, তুমি একাজ কেন করলে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি মরে যাবার পর ছেলে-মেয়েদের জীবিকা যেন ভালভাবে চলে সেজন্য। তারা গভর্ণরকে বিপদে ফেলতে এসে নিজেরাই বিপাকে পড়ে গিয়েছে ভেবে আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার এই অলী (গভর্ণর) খুবই কড়া শাসক। শাসন কাজ চালাতে গিয়ে আমাদের কোন পরামর্শ নেন না এবং আমাদের মান-সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে একটুও এদিক-ওদিক করেন না। এতে করে আমাদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে, কাজেই তাকে আমাদের ওখান থেকে সরাবার জন্য আমরা চাঁদা তুলে দুই হাযার দীনার জমা করে এই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলাম। আসলে উনি আমাদের নিকট দুই হাযার তো দূরের কথা দুই দীনারও রাখেননি। ওমর ফারূক (রাঃ) উক্ত গভর্ণরকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার! তিনি উত্তরে বললেন, এখন ওরা ঠিক বলছে। ফারূকে আযম তাঁর গভর্ণরের বুদ্ধিমত্তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সে কিভাবে শত্রুর মুখ থেকেই তার সততা ও ওদের চক্রান্তের কথা বের করে নিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অলী! তুমি কেন এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে? তিনি উত্তরে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, তারাতো কয়েকজন। একজন দাবী পেশ করেছে, তার সাথে ক'জন সাক্ষী আছে। কিন্তু আমারতো সাক্ষী নেই। কাজেই কৌশল অবলম্বন ছাড়া আরতো কোন উপায় ছিল না। আমীরুল মুমিনীন তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

শিক্ষা : ন্যায়পরায়ণ শাসকের কাছে ধনী-গরীব সবাই সমান। তিনি সৎভাবে রাষ্ট্র চালালে আল্লাহপাক তাকে যেকোন বিপদ-আপদে সাহায্য করবেন।

৯. কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার

কাযী শুরাইহ বিন হারেছ আল-কিন্দী ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন খ্যাতনামা কিংবদন্তী বিচারপতি ছিলেন। তিনি একাধারে ওমর, ওছমান, আলী এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬০ বছর যাবৎ বিচারকার্য পরিচালনার পর ৭৮ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার

নিরপেক্ষ বিচারের দীপ্তিমান ইতিহাস সর্বযুগের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। নিম্নে তার দু'টি ঘটনা বিবৃত হ'ল-

১. ইসলামের ২য় খলীফা ওমর (রাঃ) একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে ভালভাবে দেখেশুনে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। অতঃপর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে স্বীয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। ওমর (রাঃ) কালবিলম্ব না করে সরাসরি বিক্রেতার নিকটে ফিরে এলেন এবং তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে নাও, এটা ত্রুটিযুক্ত। বিক্রেতা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ঘোড়াটি ফেরত নিব না, কেননা আপনি তা সুস্থ ও সবল অবস্থাতেই আমার নিকট থেকে ক্রয় করেছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, ঠিক আছে, তাহ'লে তোমার মাঝে ও আমার মাঝে একজন বিচারক নির্ধারণ করো। বিক্রেতা বললেন, ঠিক আছে, কাযী শুরাইহ আমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন। ঘটনার বর্ণনাকারী শা'বী বলেন, তারা উভয়েই শুরাইহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন এবং তার নিকটে পৌঁছে তাকে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করলেন। কাযী শুরাইহ ঘোড়ার মালিকের অভিযোগ শ্রবণ করে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি ঘোড়াটিকে সবল ও সুস্থ অবস্থায় কিনেছিলেন? ওমর (রাঃ) বললেন, জি হ্যাঁ। বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক কাযী শুরাইহ ঘোষণা করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা ক্রয় করেছেন তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হৌন অথবা যে অবস্থায় ঘোড়াটিকে গ্রহণ করেছিলেন, সে অবস্থায় ফেরত প্রদান করুন। হতচকিত খলীফা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাযী শুরাইহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ! এটাই তো ন্যায়বিচার। হে বিচারপতি! আপনি কূফায় গমন করুন। আমি আপনাকে কূফার প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দান করলাম *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ ৯/২৫)*।

২. ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) একদিন বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খৃষ্টান লোক একটা লোহার বর্ম বিক্রি করছে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বর্মটি চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম তো আমার। চল, আদালতে তোমার ও আমার মধ্যে ফায়ছালা হবে। সেসময় ঐ আদালতের বিচারক ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন আমীরুল মুমিনীনকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী (রাঃ)-কে নিজ স্থানে বসিয়ে তিনি তাঁর

পাশে বসলেন। আলী (রাঃ) বিচারপতি শুরাইহকে বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে দিন। শুরাইহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য কি? আলী বললেন, এই বর্মটি আমার। অনেক দিন হ'ল এটি হারিয়ে গেছে। আমি তা বিক্রয় করিনি, কাউকে দানও করিনি। শুরাইহ বললেন, ওহে খৃষ্টান! আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি না, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ বললেন, বর্মটিতো এই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। কোন প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে সেটা নেয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি? আলী (রাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন। আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। নিরুপায় শুরাইহ সত্য জানা সত্ত্বেও প্রমাণের অভাবে খৃষ্টানের পক্ষেই রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে আবার ফিরে এল এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটাই নবীদের বিধান ও শিক্ষা। আমীরুল মুমিনীন নিজের দাবী বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন। আল্লাহ্র কসম, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা আপনারই বর্ম। আমি এটা আপনার কাছে বিক্রয় করেছিলাম। পরে তা আপনার মেটে রঙের উটটির উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলে আমি ওটা তুলে নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি যখন মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম এখন থেকে তোমার। অতঃপর আলী (রাঃ) তাকে ভাল দেখে একটা ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

ইমাম শা'বী বলেন, আমি পরবর্তীকালে এই নওমুসলমানকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় শা'বী বলেন, আলী (রাঃ) এছাড়া তার জন্য দু'হাযার দিরহাম ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। অবশেষে এই ব্যক্তি ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করে শহীদ হন *(বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১৩৬, হা/২০২৫২; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৮/৫)।*

শিক্ষা : ইসলাম সর্বাবস্থাতেই ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখতে বলে। আল্লাহ্র আইনের সামনে রাজা-প্রজা, মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। কারো মাঝে

Contents

কোন বিভেদ করার সুযোগ নেই। তাই ইসলামী বিচারব্যবস্থায় বিচারককে বিচক্ষণ, মহৎ ও সৎসাহসী হওয়ার সাথে সাথে নিরপেক্ষও হতে হয়। হতে হয় সরল-সহজ ও ক্ষমাশীল।

১০. হাক্কুল ইবাদ রক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত

সিরিয়া বিজেতা সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধ কৌশল হিসাবে সিরিয়া থেকে আপাততঃ সৈন্যদল পিছিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে সিরিয়ার খৃষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে তিনি তাদের নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া কর ফেরত দিয়ে দিলেন। এতে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে এসে ক্রন্দন করতে লাগল ও আকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, আপনারাই আমাদের এলাকা শাসন করুন। আমাদের স্বজাতি খৃষ্টান যালেম শাসকদের হাতে আমাদেরকে পুনরায় ন্যস্ত করবেন না। সেনাপতি বললেন, 'আপাততঃ আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু আপনাদের প্রদত্ত জিযিয়া কর আমরা রাখতে পারি না'। হাক্কুল ইবাদ রক্ষার এই অনুপম দৃষ্টান্ত দেখে তারা খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল *(বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১৩৪)*।

শিক্ষা : তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে- এ ধারণা সর্বৈব নির্জলা মিথ্যা। বরং মুসলমানদের আদব-আখলাক ও জনগণের অধিকার রক্ষায় তাদের সচেতনতাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১১. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সাদাসিধে জীবনযাপন

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাঃ) আড়াই বছর খেলাফতে থাকার পর মাত্র সাড়ে ৩৯ বছর বয়সে শত্রুদের বিষ প্রয়োগে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'ল যে, তিনি দুটি বদ্ধ ঘরে সোনা-দানা ভর্তি করে রেখে গিয়েছেন, যার সবই রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন। পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ বিন আব্দুল মালেক অভিযোগকারীকে সাথে নিয়ে ওমরের বাড়ীতে গিয়ে উক্ত কক্ষ দু'টি খুললেন। দেখা গেল সেখানে আছে কেবল একটি চামড়ার চেয়ার, একটি পিতলের বদনা, ৪টি পানির কলসি। অন্য ঘরে আছে একটি খেজুর পাতার চাটাই, যা মুছাল্লা

হিসাবে রাখা হয়েছে। আর আছে ছাদের সঙ্গে ঝুলানো একটি শিকল। যার নীচে গোলাকার একটি বেড়ী রয়েছে, যার মধ্যে মাথা ঢুকানো যায়। ইবাদতে রাত কাটানোর সময় কাহিল হয়ে পড়লে বা ঝিমুনি আসলে এটা তিনি মাথায় ঢুকিয়ে দিতেন, যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন। সেখানে একটি সিন্দুক পেলেন, যার মধ্যে একটি টুকরী পেলেন। যাতে ছিল একটি জামা ও একটি ছোট পাজামা।

আর তাঁর পরিত্যক্ত বস্তুর মধ্যে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পেলেন, তালি দেওয়া একটা জামা ও একটি মোটা জীর্ণশীর্ণ চাদর। এ অবস্থা দেখে খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং অভিযোগকারী ভাতিজা ওমর ইবনে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আসতাগফিরুল্লাহ'। আমি কেবল লোকমুখে শুনেই অভিযোগ করেছিলাম *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২২৩)*।

শিক্ষা : ইসলামী খিলাফতের খলীফাগণ এমনই মহত্তম দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসীর জন্য রেখে গেছেন, যা শত্রু-মিত্র সকলের জন্য এক চিরন্তন শিক্ষা বহন করে।

১২. আলী বিন হুসায়েন (রহঃ)-এর গোপন আমল

আলী (রাঃ)-এর পৌত্র আলী বিন হুসায়েন (রহঃ) বলতেন, 'রাতের অন্ধকারে কৃত ছাদাক্বা আল্লাহ্‌র ক্রোধ দূরীভূত করে'। তাই রাতের আঁধারে তিনি ছাদাক্বার খাদ্যসমূহ পিঠে বহন করে শহরের ফকীর-মিসকীন ও বিধবাদের গৃহে পৌঁছে দিতেন; অথচ তারা জানতে পারতো না কে তাদেরকে সেসব খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গেল। আর সবার অজান্তে যাতে এ কাজ করতে পারেন, সেজন্য তিনি কোন খাদেম, দাস বা কারোরই কোন সহযোগিতা নিতেন না। এভাবে অনেক বছর যাবৎ তিনি গোপনে এ কাজ করে যাচ্ছিলেন। অথচ ফকীর ও বিধবারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, কিভাবে তাদের নিকটে এ খাদ্য আসে। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলে তারা তার পৃষ্ঠদেশে কালো দাগ দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি তাঁর পিঠে কিছু বহন করার ফলে এই দাগের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে তাঁর মৃত্যুর পর শহরে উক্ত গোপন দান বন্ধ হয়ে গেল। রাবী ইবনে আয়েশা বলেন, তাঁর মৃত্যুর পর শহরবাসী বলতে লাগল, আলী বিন হুসায়েন মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা গোপন দান থেকে বঞ্চিত হইনি *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/১৩৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৯৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৯/১১৪; তাহযীবুল কামাল ১৩/২৪২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩৯৩)*।

শিক্ষা : মানুষের যেকোন কাজের মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। সে লৌকিকতার জন্য কোন কাজ করবে না।

১৩. ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ)-এর গোপন আমল

ইরাকের বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম মাওয়ার্দী (৯৭২-১০৫৮ খ্রিঃ)-এর গোপন আমল সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ রয়েছে। তিনি তাফসীর, ফিক্বহ, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সেসব গ্রন্থের কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। পরে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে এনে বললেন, 'অমুক স্থানে যে বইগুলি রয়েছে সবগুলিই আমার রচিত। যখন আমার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হবে, তখন তুমি তোমার হাতকে আমার হাতের মধ্যে রাখবে। এসময় যদি আমি আমার হাত টেনে নেই, তাহ'লে তুমি বুঝবে যে, আমার কিছুই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়নি। এমতাবস্থায় তুমি রাতের আঁধারে আমার সমস্ত লেখনী দজলা নদীতে নিক্ষেপ করবে। আর যদি আমি আমার হাত প্রসারিত করি, তাহ'লে বুঝবে যে, আমার লেখাগুলো আল্লাহ্র নিকটে কবুল হয়েছে। আর আমি আমার খালেছ নিয়তে কৃতকার্য হয়েছি'। অতঃপর মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় হাত প্রসারিত করে দিলেন। ফলে তাঁর অছিয়ত মোতাবেক পরবর্তীতে তাঁর সকল লেখনী প্রকাশিত হ'ল *(অফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/২৮৩; তারীখু বাগদাদ ১/৫৪; তাবাকাতুশ শাফেঈয়্যাহ ৫/২৬৮)*।

শিক্ষা : মানুষের প্রতিটি কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত পরিশুদ্ধ হলেই কেবল তার নেক আমল আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয়।

১৪. কুরআনের ইলাহী সংরক্ষণ ও একজন ইহুদী পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণ

আব্বাসীয় খলীফা মামূনুর রশীদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ত। এতে তৎকালীন বিভিন্ন বিষয়ের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ অংশগ্রহণ করতেন। একদিন এমনি এক আলোচনা সভায় সুন্দর চেহারাধারী, সুগন্ধযুক্ত উত্তম পোষাক পরিহিত জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করলেন এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা

রাখলেন। বিস্মিত খলীফা সভা শেষে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইহুদী? তিনি স্বীকার করলেন। মামূন তাকে বললেন, আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান তবে আপনার প্রতি সুন্দরতম আচরণ করা হবে। তিনি উত্তরে বললেন, পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

কিন্তু এক বছর পর তিনি মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করলেন এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিক্বহ সম্পর্কে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। সভা শেষে মামূন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন, যিনি গত বছর এসেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিই ঐ ব্যক্তি। মামূন জিজ্ঞেস করলেন, তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এখন মুসলমান হওয়ার কারণ কি?

তিনি বললেন, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি সমকালীন বিভিন্ন ধর্মগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার মনস্থ করি। আমি একজন সুন্দর লিপিকার। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। তাই পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম এবং এগুলির অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু কমবেশী করে লিখলাম। অতঃপর কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হ'লাম। তারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমার কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর একইভাবে ইঞ্জীলের তিন কপি করলাম এবং তাতে কমবেশী করে লিখে খৃষ্টানদের গীর্জায় নিয়ে গেলাম। সেখানেও তারা খুব আগ্রহভরে কপিগুলো ক্রয় করে নিল। এরপর আমি কুরআনের ক্ষেত্রেও একই কাজ করলাম এবং এতেও কম-বেশী করে লিখলাম এবং বিক্রয়ের জন্য নিয়ে গেলাম। কিন্তু ক্রয়কারীকে দেখলাম, সে প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না যাচাই করে দেখল। অতঃপর সেখানে কমবেশী দেখতে পেয়ে ক্রয় না করে কপিগুলো ফেরত দিল।

এ ঘটনা দর্শনে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ সংরক্ষিত, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর সংরক্ষক। আর এই উপলব্ধিই আমার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

এই ঘটনা বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ্ইয়া বিন আকছাম বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার সাথে সাক্ষাত হ'লে ঘটনাটি আমি তার নিকটে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই যথার্থ। কারণ কুরআনেই তো এ চিরন্তন সত্যের সমর্থনে আয়াত রয়েছে। তিনি বললেন, কোথায় রয়েছে? সুফিয়ান বললেন, কুরআনে যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা এসেছে, সেখানে এসেছে, بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 'তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এ ব্যাপারে সাক্ষী ছিল' *(মায়েদা ৫/৪৪)*। অতঃপর যখন তারা দায়িত্ব পালন করেনি তখন গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ১৫/৯)*। আল্লাহ নিজেই আমাদের জন্য কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন ফলে তা বিনষ্ট হয়নি *(আল-মুনতাযাম ১০/৫১; কুরতুবী ১০/৫; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ১/৩৮৮)*।

শিক্ষা : অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ কালের বিবর্তনে বিকৃত হয়ে গেলেও কুরআন রয়ে গেছে সম্পূর্ণ অবিকৃত। এটা কুরআনের অন্যতম মু'জিযা।

১৫. বীর সেনানী মুহাম্মাদ বিন কাসিম

বিখ্যাত তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম ঐতিহাসিক সিন্ধু বিজয়ের পর মাত্র সাড়ে তিন বছর সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর সুচারু দেশ পরিচালনায় সিন্ধুবাসী এতই মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, যখন তিনি সিন্ধু ছেড়ে রাজধানী দামেশকে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেন, তখন সিন্ধুর অমুসলিম নাগরিকরা পর্যন্ত রাস্তায় কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছিল যেন তিনি এ দেশ থেকে চলে না যান। পরে মিথ্যা অজুহাতে যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হ'ল, সে খবর শুনে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাঁর 'মূর্তি' গড়ে পূজা শুরু করে দিয়েছিল *(বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৪৪৬)*।

শিক্ষা : মুসলিম বিজেতাগণ তাদের সুসভ্য আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের সোনালী পাতায় লিপিবদ্ধ এমনই অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এটি একটি জ্বলন্ত ঘটনা।

১৬. অমুসলিমের অধিকার রক্ষায় বাদশাহ আওরঙ্গযেব

বাদশাহ আওরঙ্গযেব বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও রাজকোষ থেকে কোন বেতন-ভাতা নিতেন না। নিজ হাতে টুপী সেলাই করে আর কুরআন মজীদ কপি করে যা পেতেন, তাই দিয়ে অতি কষ্টে দিন গুযরান করতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মান হয়ে কেঁদে চক্ষু ভাসাতেন।

তাঁর জীবনের অসংখ্য শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ছিল নিম্নরূপ: তাঁর একজন মুসলিম সেনাপতি পাঞ্জাব অভিযানকালে একটি গ্রাম অতিক্রম করছিলেন। সে সময় একজন ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী এক মেয়েকে দেখে তিনি তার পিতার কাছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পিতা অনন্যোপায় হয়ে বাদশাহ্‌র শরণাপন্ন হলেন। ওয়াদা অনুযায়ী উক্ত সেনাপতি একমাস পরে বরের বেশে উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন ছদ্মবেশী সম্রাট আলমগীর উলঙ্গ তরবারি হাতে স্বয়ং তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে সেনাপতি সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গ্রামবাসী হিন্দুরা ঐদিন থেকে গ্রামের নাম পাল্টিয়ে রাখলো 'আলমগীর'। যে কামরায় বসে বাদশাহ আলমগীর ঐ রাতে ইবাদতে রত ছিলেন, ঐ কামরাটি আজও হিন্দুদের নিকট পবিত্র স্থান বলে সম্মানিত হয়ে আছে। কেউ সেখানে জুতা পায়ে প্রবেশ করে না *(ইতিহাসের ইতিহাস, পৃঃ ১৬৬)*।

শিক্ষা : আধুনিক বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবীদার রাষ্ট্র ভারত সরকার কি বর্তমানে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করতে পারছে? না, বরং প্রতিনিয়ত তাদের প্রতি চালাচ্ছে নির্যাতনের স্টীম-রোলার। অথচ মুসলিম শাসক আওরঙ্গযেব মাত্র একজন হিন্দুর অধিকার হরণের ঘটনাকে বরদাশত করতে না পেরে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। এরপরেও কি তাদের বোধোদয় হবে না?

১৭. সম্রাট বাবরের মহত্ত্ব

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর দিল্লীর সম্রাট ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। ভারতের বাইরের মুসলিম সম্রাটগণ বহুবার ভারতের বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে বহু ধন-সম্পদ হস্তগত করে আবার স্বদেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু সম্রাট বাবর এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রাজা সংগ্রাম সিংহ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে বাবরকে বেশি শক্তিশালী হ'তে আর সময় দিতে চাইল না। তাই সে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত ও নিহত হ'ল। ফলে বাবর আরো শক্তিশালী হ'লেন।

এদিকে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ রাজপুতদের মধ্য থেকে এক যুবক মনে করল, বাবরকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না। তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর প্রাণ সংহার করতে হবে। যুবক বাবরের রক্তে জন্মভূমির পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইল। তাই সে বাবরের সন্ধানে ছুরিসহ ছদ্মবেশে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবরকে ছুরিকাঘাতে নিহত করাই তার একমাত্র পণ।

একদিন সে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দেখতে পেল, জনগণ রাজপথ ছেড়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে। রাজপথে পাগলা হাতী ছুটে চলেছে। তারই ভয়ে জনগণের এই ছুটোছুটি। এদিকে পথে একটি শিশু পড়ে আছে। ভয়ে কেউ শিশুটিকে উদ্ধার করতে এগুচ্ছে না। সবাই হায় হায় করে বলতে লাগল যে, শিশুটি হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা যাবে। কে একজন শিশুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিরস্ত করা হ'ল। বলা হল, অচ্ছুৎ মেথরের ছেলেকে ছুঁয়ো না।

এমন সময় জনতার ব্যূহ ভেদ করে কে একজন সাহসী ব্যক্তি দ্রুতগতিতে শিশুটিকে উঠিয়ে জনতার কাতারে মিশে গেলেন। হাতীটি হুংকার করতে করতে চলে গেল। পরে জানা গেল সেই সাহসী ব্যক্তিটি ছিলেন স্বয়ং সম্রাট বাবর।

স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে যুবকটির ভাবান্তর হ'ল। উদ্ধারকর্তাকেও সে চিনতে পারল। তিনিই সে ব্যক্তি যাঁর প্রাণ সংহার করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুবকটি

তৎক্ষণাৎ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্থির করল যে, সে বাবরের কাছে তার পরিচয় দিয়ে দিল্লীর রাজপথে তার ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। পরিণাম যাই-ই হৌক তাতে তার কিছু যায় আসে না। তাই সে ধীরপদে বাবরের সামনে এল এবং লুক্কায়িত ছুরি বের করে বাবরের সামনে রাখল। অতঃপর বলল, এই ছুরির আঘাতে আমি আপনার প্রাণনাশ করতে চেয়েছিলাম। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি উপলব্ধি করলাম, প্রাণনাশের চেয়ে প্রাণরক্ষা করাই মহৎ কাজ। বাবর যুবককে বুকে টেনে নিলেন এবং তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত করলেন।

শিক্ষা : মহত্ত্ব নিজেই এমন একটি মহৎ গুণ, যা মহৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও মহৎ করে তুলে।

১৮. তাক্বওয়ার পুরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন, –يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর’ *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র তিনি ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ– ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। আল্লাহ পাক আরো বলেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– ‘তোমরা পুণ্যের কাজে ও আল্লাহভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ কাজে ও সীমালংঘনে পরস্পরকে সাহায্য করো না, আর আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর’ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

এ সম্পর্কিত উপদেশমূলক একটি ঘটনা, সিরিয়ার বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ ত্বানতাভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটা এই যে, একটি ছেলে নেক ও সৎ স্বভাবের ছিল। তার মধ্যে তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) ও পরহেযগারিতা ছিল। বিদ্যার্জনের প্রতি তার খুব একটা স্পৃহা ছিল না। সে একটা মাদরাসায়

পড়ত। সে শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক চলত। জ্ঞানার্জনের শেষ পর্যায়ে একদিন তার উস্তাদ তাকে এবং তার সহপাঠীদেরকে নছীহত করলেন, জীবনে কখনো মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না। কারণ মানুষের সামনে হাত পেতে ধরা আলেম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য যে, দাতারা যা কিছু বলবে এবং যা কিছু করবে দানগ্রহীতা আলেম তার কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ সে তাদের অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে পড়ে। অতএব তোমরা ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পিতার পেশা অবলম্বন করে জীবিকার্জন করবে। আর যেকোন কাজে আল্লাহকে ভয় করবে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করবে।

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ী ফিরে গেল। ঐ ছেলেটিও বাড়ী গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, মা আমার বাবার পেশা কি ছিল? ছেলের এই প্রশ্নে মা হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, বেটা বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে তোমার বাবা ইন্তিকাল করেছেন। তোমার বাবার পেশার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? এতদিন পরে তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? ছেলে তার বাবার পেশা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আর তার মা টালবাহানা করতে থাকলেন। ছেলের পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে মা ছেলের পিতার পেশা বলতে বাধ্য হ'লেন। তিনি বললেন, তোমার আব্বার কোন ভাল পেশা হ'লে তা বলতে আমার এত দ্বিধা হ'ত না। তোমার পীড়াপীড়িতে বলতে হচ্ছে, তোমার আব্বার পেশা ছিল চৌর্যবৃত্তি। ছেলে তার মায়ের উত্তর শুনে বলল, আম্মা! আমার উস্তাদ সকল ছাত্রকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতার পেশা অবলম্বন কর। আর সব কাজে তাক্বওয়ার খেয়াল রেখো। মা বললেন, চুরি করতে তাক্বওয়া অবলম্বন! এ কেমন কথা? ছেলে বলল, আম্মা! উস্তাদ এই কথাই বলেছেন।

অতঃপর ছেলেটি চুরি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে শুরু করল। যথারীতি প্রশিক্ষণ নিল। সে প্রয়োজনীয় উপকরণও সংগ্রহ করল। প্রশিক্ষণ শেষে সে চিন্তা-ভাবনা করে কাজের পরিকল্পনা তৈরী করল। একদিন এশার ছালাত আদায় করার পর লোকজনের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে লাগল। লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ল, চতুর্দিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সে প্রথমে প্রতিবেশীর ঘরেই চুরি আরম্ভ করার সংকল্প করল। সে প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রবেশ করতে গেলে উস্তাদের নছীহত তার স্মরণ হ'ল। সে মনে মনে বলতে লাগল, প্রতিবেশীর

ঘরে চুরি করা ও তাকে কষ্ট দেওয়া তো তাক্বওয়া বিরোধী কাজ। এতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং সে প্রতিবেশীর ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। সেটা ছিল এক ইয়াতীম-অনাথের ঘর। এর ঘরে চুরি করাও তাক্বওয়াবিরোধী কাজ। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। ফলে সে এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। এইভাবে যখনই সে কোন ঘরের কাছে আসে এবং চুরি করার ইচ্ছা করে তখনই কিছু না কিছু ভাবনা তার মনে উদয় হয়, অতঃপর তা তাক্বওয়াবিরোধী কাজ ভেবে আরও অগ্রসর হ'তে থাকে। এভাবে সে একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। এটা জনৈক ব্যবসায়ীর ঘর। সে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তার একটা মাত্র কন্যা সন্তান। মনে মনে বলল, হ্যাঁ, এই ঘরে চুরি করা চলে। অতঃপর চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে প্রবেশ করে দেখল এতে অনেকগুলি কক্ষ রয়েছে। সে ঐ বিশাল ঘরে ঘুরতে লাগল। যেন সে চোর নয়; বরং কোন মেহমান। শেষে তার দৃষ্টি পড়ল একটা সিন্দুকের উপর। সেটা খুলে দেখল তা সোনা-চাঁদি, টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। সে সিন্দুক থেকে মাল-ধন বের করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তার উস্তাদের উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে বলতে লাগল, প্রথমতঃ এই ব্যবসায়ী তার মালের যাকাত দিয়েছে কি-না, তা জানা নেই। সর্বাগ্রে তার যাকাতের হিসাব পর্যালোচনা করা যাক। সুতরাং সে হিসাব সংক্রান্ত খাতাপত্র বের করে সঙ্গে আনা ছোট লণ্ঠনটি জ্বেলে নিল এবং তার আলোতে খাতাপত্রগুলি তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। সে হিসাব-কিতাবে বেশ অভিজ্ঞ ছিল। সে দ্রুত সম্পদের পূর্ণ হিসাব করে ফেলল এবং যাকাতের অংশ বের করে পৃথক রাখল।

হিসাব-নিকাশে সে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, সময়ের কোন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মনে হ'ল ফজরের সময় হয়ে গেছে। সে নিজের মনেই বলল, তাক্বওয়ার চাহিদা হচ্ছে প্রথমে ফজরের ছালাত সমাপন, তারপর কাজ। সে ঘর থেকে বের হয়ে আঙ্গিনায় এসে ওযূ করল। তারপর ছালাতের জন্য ইক্বামত দিল। ঘরের মালিক ইক্বামত শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ছোট একটি লণ্ঠন টিপ টিপ করে জ্বলছে। সিন্দুক খোলা এবং তার সম্মুখে এক তরুণ ছালাত আদায় করার জন্য ইক্বামত দিচ্ছে। ঘরের গৃহীনীও জেগে গেছে। সে এইসব দেখে স্বামীকে

জিজ্ঞেস করছে, ওখানে কি হচ্ছে? গৃহকর্তা বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। অতঃপর সে দোতলা থেকে নেমে ঐ তরুণের কাছে গিয়ে বলল, তুমি কে? আর তুমি করছই বা কি? চোর ছেলেটি বলল, প্রথমে ছালাত, পরে কথা। ঘরের মালিক যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছিল। তরুণ তাকে বলল, আপনি শীঘ্র ওযূ করে আসুন। সে ওযূ করে এলো। তরুণ বলল, আপনি ছালাতে ইমামতি করুন। সে তরুণকে বলল, না, বরং তুমি ইমামতি কর। তরুণ বলল, আপনি এই ঘরের মালিক। আপনিই ইমামতি করার বেশী হক্বদার। সে এসব চিন্তাই করতে পারেনি। সে নিজের জানমাল নিয়ে শঙ্কিত। কোন রকমে ছালাত শেষ করল। ভয় ও শঙ্কায় তার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। ছালাত শেষ হ'লে মালিক বলল, এখন বল তুমি কে? এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? আমার সিন্দুক খোলা কেন? তরুণ বলল, আমি চোর, চুরি করার জন্য এসেছি। কিন্তু আপনি বলুন, যাকাত আদায় করেন না কেন? আমি আপনার খাতাপত্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। আপনি ছয় বছর থেকে যাকাত আদায় করেননি। এটা আল্লাহ্র হক্ব, যা ফরয। আমি হিসাব করে দিয়েছি এবং যাকাতের মাল পৃথক করে রেখেছি। যাতে আপনি যাকাতের হক্বদার ব্যক্তিদেরকে পৌঁছে দিতে পারেন। এসব কথা শুনে গৃহস্বামী স্তম্ভিত হয়ে গেল। তুমি এসব কি করেছ? তুমি কি পাগল? সে বলল, আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। গৃহকর্তা বলল, তাহ'লে তুমি চুরি করছ কেন? উত্তরে ছেলেটা সম্পূর্ণ কাহিনী ব্যবসায়ীকে শুনাল।

ব্যবসায়ী ছেলেটির সহজ-সরল সুদর্শন চেহারা এবং হিসাব-নিকাশে তার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় স্ত্রীর কাছে গেল এবং তরুণ চোর সম্পর্কে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। অতঃপর সে বলল, তুমি তোমার একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য পেরেশান ছিলে। আল্লাহ তা'আলা তোমার ঘরে পাত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবকিছু শুনে স্ত্রীও একমত পোষণ করল।

অতঃপর সে তরুণ ছেলেটার নিকটে এসে বলল, দেখ চুরি করা খুব জঘন্য কাজ। তোমার ধন-সম্পদ দরকার হ'লে এবং তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার সম্পদের অংশীদার করতে পারি। তরুণ বলল, সেটা কিভাবে? ব্যবসায়ী বলতে লাগল, আমার একটি মাত্র কন্যা। আমি তার বিবাহ তোমার

সঙ্গে দিতে চাই। আমি তোমাকে আমার সম্পদের প্রধান হিসাব রক্ষক নিয়োগ করতেও প্রস্তুত আছি। তোমাকে বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অর্থ আমি প্রদান করব। তুমি তোমার মার সঙ্গে পরামর্শ করে নাও।

তরুণ ছেলেটি এই প্রস্তাবে তার সম্মতি প্রকাশ করল। সে তার মাকে বলতেই তিনি রাযী হ'লেন। পরবর্তীতে দিন ধার্য করে ব্যবসায়ী ঐ তরুণের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিলেন।

শিক্ষা : তাক্বওয়াশীল মানুষকে আল্লাহ তার তাক্বওয়ার মাধ্যমেই হেদায়াত দান করেন এবং বিনিময়ে অঢেল পুরস্কার প্রদান করেন।

১৯. মৃত্যুর দুয়ারে ত্যাগের মহিমা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই ভালবাসবে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে' *(বুখারী হা/১৩)*।

ইয়ারমুক যুদ্ধের বিশাল ময়দান। এক প্রান্তে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদল আর অপর প্রান্তে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী। উভয় দলই ভয়াবহ এক যুদ্ধের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। যুদ্ধ শুরুর পূর্বমুহূর্তে আবূ ওবায়দাহ, মু'আয বিন জাবাল, আমর ইবনুল আছ, আবূ সুফিয়ান, আবু হুরায়রা প্রমুখ ছাহাবী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। আবূ ওবায়দাহ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে স্থির রাখবেন। হে মুসলিম সেনাবাহিনী! তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কেননা ধৈর্য কুফরী থেকে বাঁচার, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের এবং লজ্জা নিবারণের উপায়। তোমরা তোমাদের যুদ্ধের সারি থেকে সরে দাঁড়াবে না। কাফেরদের দিকে এক ধাপও অগ্রসর হবে না এবং আগ বেড়ে তাদের সাথে যুদ্ধের সূচনাও করবে না। শত্রুদের দিকে বর্শা তাক করে থাকবে এবং বর্ম দিয়ে আত্মরক্ষা করবে। তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা মনে মনে আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাকবে'।

যুদ্ধ শুরু হ'ল এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। যুদ্ধের সময় হুযায়ফা (রাঃ) আহতদের মধ্যে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। তার সাথে ছিল সামান্য পানি। হুযায়ফার চাচাতো ভাইয়ের শরীর দিয়ে অবিরত ধারায় রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হুযায়ফা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে তার কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হ্যা সূচক ইঙ্গিত করল। আহত ব্যক্তি হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে তার পূর্বে তাকে পানি পান করানোর জন্য হুযায়ফাকে ইঙ্গিত দিলেন। হুযায়ফা তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি পানি পান করতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি পানি পান না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো। হুযায়ফা আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মিটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি। অথচ সবারই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১ প্রভৃতি দ্রঃ)*।

শিক্ষা : মুমিন ব্যক্তি সর্বদা মানুষের জন্য অন্তঃপ্রাণ থাকে। সে নিজেকে কখনো পরের উপরে প্রাধান্য দেয় না। বরং সর্বদা অপরের কল্যাণকেই ধ্যান-জ্ঞান করে। জীবনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে পর্যন্ত সে তার কর্তব্য ভুলে যায় না। এমনকি পরার্থে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না। সর্বদাই তাঁর হৃদয়কন্দরে গুঞ্জরিত হতে থাকে, 'সকলের তরে আমরা সবে, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'।

২০. শত্রুর জিঘাংসা

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আলী বিন আবু ত্বালিব (রাঃ)-এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান বিন মুলজিম বন্দী অবস্থায় (হযরত আলীকে হত্যার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল) থাকাকালীন সময়ে হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর নিকট যখন নিয়ে আসা হ'ল, তখন সে বলল, হে হাসান! আমি তোমার সাথে কানে কানে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি অস্বীকার করলেন এবং সাথীদেরকে বললেন, তোমরা জান সে কি চেয়েছে? তারা উত্তর দিলেন, না। হযরত হাসান বললেন, সে চেয়েছিল আমি আমার কান তার মুখের কাছে নিয়ে গেলে সে দাঁত দিয়ে আমার কানটি কেটে নিবে। ঐ পাপী একথা শুনে বলল, আল্লাহ্র কসম আমি ঠিক এমনটাই ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। চিন্তা করে দেখুন, সবেমাত্র হযরত হাসান (রাঃ)-এর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ এখন বিব্রতকর অবস্থায় আছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি কিভাবে ঐ বদমায়েশের কূট-কৌশলের রহস্যটি বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং ঐ শয়তান মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কি ধরনের জঘন্য চাল চালতে চাইল!! *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আত-তুরুক আল-হুকমিইয়্যাহ ১/৩৭)*।

শিক্ষা : শত্রু সুযোগ পেলেই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অতএব সর্বদা সাবধান থাকতে হবে।

২১. বুদ্ধিমান বালক

(১) খলীফা মামূনুর রশীদ তাঁর একটি ছোট্ট ছেলের হাতে হিসাবের খাতা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস এটা কি? বাচ্চা উত্তরে বলল, এটা এমন একটি বস্তু যাতে মানুষের মস্তিষ্ক তীক্ষ্ম হয়, অলসতা দূরীভূত হয় ও সচেতনতা ফিরে আসে এবং একাকী থাকার সময় সঙ্গী হয়। খলীফা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এমন ছেলে দিয়েছেন, যে চর্মচক্ষুর চেয়ে জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে বেশী দেখে।

(২) আছমা'ঈ বলেন, আমি আরবের একজন কিশোরকে বললাম, হে বৎস! তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, তোমাকে এক লক্ষ টাকা দিব এবং তুমি আহাম্মক (বোকা) হবে। সে উত্তরে বলল, না। আমি বললাম, কেন? সে

বলল, হ'তে পারে একদিন এই টাকা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আহাম্মক দোষটি আমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে।

শিক্ষা : অনেক সময় ছোট্ট বাচ্চাদের মুখ থেকে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা বের হয়, যা কল্পনাও করা যায় না।

২২. মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও জনৈক ভিক্ষুক

একবার আল্লামা ইকবাল জনৈক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন। লোকটি যাবার সময় তাঁকে দো'আ করল এই মর্মে যে, 'মৃত্যুর পরে আপনার আত্মা যেন মহান পরমাত্মার দয়ার সাগরে মিশে যায়'। ইকবাল তাকে ডেকে বললেন, 'বরং তুমি এই দো'আ কর যে, ইকবালের আত্মা যেন বৃষ্টি বিন্দুর ন্যায় মহাসাগরে বিলীন না হয়ে তার উপরে মুক্তার ন্যায় ভেসে থাকে'।

এর দ্বারা মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ) মা'রেফতী ছূফীদের প্রচারিত ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদী আক্বীদার প্রতিবাদ করেছেন। যারা বলে যে, 'সকল সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার অংশ। আহাদ ও আহমাদের মধ্যে মীমের একটি পর্দা ব্যতীত কোন পার্থক্য নেই। যত কল্লা তত আল্লা। তিনি নিরাকার। তিনি সবার মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান'। অথচ প্রকৃত আক্বীদা হ'ল এই যে, সৃষ্টি ও সৃষ্টা সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি সত্তা। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হ'তে পারে। কিন্তু সে আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হয়ে যায় না। আল্লাহ নিজ সত্তা নিয়ে আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত। কিন্তু তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান।

শিক্ষা : আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ পরকালে মুক্তির সোপান। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত আক্বীদা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয় এবং জাহান্নামকে অবধারিত করে দেয়।

২৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও ছূফীদের গল্প

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ)-এর সময়ে সিরিয়া এলাকায় ছূফীদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। তারা 'কারামতের' নামে বিভিন্ন ভেল্কিবাজি দেখিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করত ও তাদের গোলামীতে আবদ্ধ করত। দেশের

নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা ছাড়াও হাযার হাযার সাধারণ লোক তাদের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ছূফীরা নিজেদেরকে ‘বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী’ এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলে মিথ্যা দাবী করত। তারা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করত, কিন্তু পুড়ত না। এ কারণে লোকেরা ভাবত, এইসব ছূফীর শিষ্য হ’তে পারলে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মানুষ ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে দলে দলে তাদের খানকাহে হাযির হয়ে নযর-নেয়ায দিয়ে তথাকথিত মা‘রেফাতের সবক নেওয়া শুরু করল।

গোমরাহীর এই স্রোত ঠেকানোর জন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সিরিয়ার বাদশাহ্র নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বাদশাহ! আমি এই ছূফীদের চ্যালেঞ্জ করছি। আপনি ওদের হাযির করুন। বাদশাহ বললেন, ওরা তো বলে যে, ওদের এক ধরনের ‘হাল’ হয়। যার কারণে ওরা আগুনে প্রবেশ করলেও অক্ষত থাকে। ‘শরী‘আতপন্থী কোন ব্যক্তি একাজ করতে সক্ষম নয়’ বলে ওরা দাবী করে থাকে।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বললেন, আমিও আগুনে প্রবেশ করব। তবে একটা শর্ত আছে, যেটা ওদের সাথে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় গিয়ে বলব। আপনি ওদের নেতাদের হাযির করুন।

বাদশাহ ছূফী সম্রাটদের দরবারে হাযির করলেন। যথাসময়ে ছূফী সম্রাট তার সাথী শায়েখ খলীফা সাইয়েদ আহমাদ ও শায়েখ হাতেম প্রমুখকে নিয়ে উপস্থিত হ’লেন। অতঃপর তারা তাদের টেকনিক অনুযায়ী প্রথমে অনেকগুলি মা‘রেফতী কসরৎ করলেন। তারপর ‘হাল’ হ’ল। এরপর ছূফী সম্রাট আগুনে প্রবেশ করতে উদ্যত হ’লেন। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বাধা দিয়ে বললেন, ‘খাল’ (সাবান-এর ন্যায় এক প্রকার বস্তু) ও গরম পানি দিয়ে আগে গোসল কর। তারপর আগুনে প্রবেশ কর’। কিন্তু ছূফী সম্রাট চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, এটাই আমাদের মা‘রেফতী তরীকা। গোসল করাটা আমাদের তরীকা বিরোধী। ইবনু তায়মিয়াহ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মোমবাতির আগুনে কেবল তোমার আঙ্গুলটি পোড়াও, আমিও আঙ্গুল পোড়াব। কিন্তু শর্ত হ’ল, আগে তোমার আঙ্গুলগুলো ভালভাবে গরম পানি ও ‘খাল’ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কিন্তু ছূফী সম্রাট এতে আরও ক্ষেপে উঠল ও

রাগান্বিত হয়ে চলে গেল। তখন সমবেত হাযার হাযার জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বললেন, আসল রহস্য হ'ল এই যে, এরা হাতে পায়ে ও সারা দেহে 'কিবরীত' নামক এক প্রকার তৈল মর্দন করে। যা আগুন থেকে দেহকে রক্ষা করে। এটাকেই লোকেরা তাদের 'কারামত' মনে করে। আর এই সুযোগে ছূফীরা ভক্তদের ঈমান চুরি করে ও তাদের পকেট ছাফ করে। এরা শয়তানের এজেন্ট। এদের থেকে সকলে সাবধান হও'। তিনি বলেন, যদি কেউ অলৌকিকতা দেখিয়ে আগুনে প্রবেশ করে বা আকাশে ওড়ে বা পানিতে হেঁটে বেড়ায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা বড় দাজ্জাল আকাশকে বলবে, 'পানি বর্ষণ কর' তখন বৃষ্টি হবে। মাটিকে বলবে, 'উৎপাদন কর' তখন বিভিন্ন গাছ জন্মাবে। সে বলবে, হে যমীন! তোমার খনিগুলোকে বের করে দাও। তখন সব খনিজ সম্পদ বেরিয়ে আসবে। সে মানুষ হত্যা করবে, তারপর বলবে, উঠে দাঁড়াও। তখন সে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে'। অতএব হে জনগণ! অলৌকিকতার মধ্যে কোন শিক্ষা নেই। প্রকৃত শিক্ষা হ'ল এ বিষয়ে যে, মানুষের কাজ-কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হচ্ছে কি-না। কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল সবকিছুর মাপকাঠি।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর এই সাহসী পদক্ষেপের ফলে হাযার হাযার মানুষ মা'রেফাতের ধোঁকা থেকে মুক্ত হ'ল এবং পুনরায় কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে ফিরে এল।

[উল্লেখ্য যে, সমাজের দুনিয়াপূজারী আলেম ও ভণ্ড পীর-আউলিয়াদের চক্রান্তে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে ৮ বার জেল খাটতে হয় এবং জেলখানাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।]

শিক্ষা : ছূফী/ব্রেলভীদের যাবতীয় ভ্রান্ত কারামতের ভেল্কিবাজি থেকে সাবধান থাকুন! যাতে তারা ঈমানদারদের ঈমান হরণ করতে না পারে।

২৪. ইহসান ইলাহী যহীর ও ভণ্ড ছূফীর কেরামতি!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর বাতিল ফিরকাগুলোর কেন্দ্রে ও তাদের মাহফিলে গিয়ে মুনাযারা করতেন নির্ভয়ে-নিঃশঙ্কচিত্তে। ১৯৬৫ সালে ইরাকের সামার্রায় এক রেফাঈ ছূফী নেতার সাথে তাঁর মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ছূফী নেতার দাবী ছিল, সে

কারামতের অধিকারী। অস্ত্র তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লামা যহীর এর প্রত্যুত্তরে বিতর্কসভায় বলেছিলেন, যদি অস্ত্র, বর্শা ও চাকু আপনাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে আপনারা কেন যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন না? গুলি ও অন্যান্য মারণাস্ত্র যাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, সেসব লোকের ইরাকের বড্ড প্রয়োজন। তিনি সেখানে ঐ রেফাঈ ছূফী নেতাকে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি আমার হাতে একটা রিভলভার দিন। আমি গুলী ছুঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে কি-না। একথা বলার পর ঐ ভণ্ড ছূফী পালাতে দিশা পায়নি *(দিরাসাত ফিত-তাছাওউফ, পৃঃ ২৩২)*।

শিক্ষা : ভণ্ড ছূফীরা শয়তানী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজেদের অনেক বড় কিছু হিসাবে পরিচয় দেয় এবং অজ্ঞ মানুষকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তাদের কূটচক্র তাসের ঘরের চেয়েও দুর্বল। কেবল আল্লাহর উপর ভরসাহীন মূর্খরাই এদের প্রতারণার শিকার হয়।

২৫. মহাকবি আল্লামা ইকবাল ও জনৈক পীর ছাহেব

বর্তমান ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যের হোসিয়ারপুরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনে মহাকবি আল্লামা ইকবাল (মৃঃ ১৯৩৮) একবার অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ভারতবর্ষের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে জনৈক পীর ছাহেব হাযির ছিলেন। তাঁকে দেখে জনৈক মুরীদ এসে ৫/= নযরানা পেশ করে তার জন্য দো‘আর আবেদন করেন। যাতে তার ৫০/= ঋণ থেকে আল্লাহ সত্বর মুক্ত করেন। সেই যামানায় এই টাকার যথেষ্ট মূল্য ছিল। যাইহোক পীর ছাহেবের আবেদনক্রমে তাঁর সাথে উপস্থিত সকলে হাত উঠিয়ে দো‘আয় শরীক হ’লেন। কিন্তু আল্লামা ইকবাল শরীক হ’লেন না। দো‘আ শেষে পীর ছাহেবের প্রশ্নের জওয়াবে ইকবাল বললেন, ‘দো‘আ চাওয়ার পূর্বে লোকটি ৫০/= টাকা ঋণী ছিল। এখন আপনার কাছে দো‘আ চাইতে গিয়ে সে ৫৫/= টাকা ঋণগ্রস্ত হ’ল। তাই আমি আবার দো‘আ করে তার ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইনি’।

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, শুধু দো‘আ নয়, বরং সবাই মিলে অর্থ সাহায্য করে লোকটিকে ঋণমুক্ত করাই ছিল ইসলামী নীতি। তাছাড়া নযরানার

নামে ৫/= ঘুষ নিয়ে দো‘আ করলে ঐ দো‘আ নিঃস্বার্থ হয় না এবং তা আল্লাহ কবুল করেন না।

শিক্ষা : সাধারণ মানুষের পকেট ছাফ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া ভণ্ড পীর-ফকীর থেকে সাবধান!

২৬. পীরভক্তি

জনৈক পীর পীরগিরিতে যদিও সফলকাম হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর ছেলেকে ঐ বিদ্যায় পারদর্শী না করে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ইচ্ছুক হলেন। এসএসসি পাশের পর ছেলেকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন এবং তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর তিনি মারা গেলেন।

ছেলের নাম আব্দুল্লাহ। ছেলের আইএ ফাইনাল পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলো। পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। পীরগিরি করেই তিনি সংসার চালাতেন। পিতার মৃত্যুতে ছেলে আর্থিক দিক দিয়ে চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ল। কিন্তু পড়াশুনা ত্যাগ করল না। পরীক্ষার ফী বাবদ শ্বশুরের নিকট থেকে টাকা পাবার প্রত্যাশায় সে একদিন শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মাঝ পথে তার পিতার অনেক মুরীদ রয়েছে। ক্বাসেম গোলদার নামে এক বুড়ো অবস্থাপন্ন মুরীদের বাড়ীতে ঠিক দুপুরে আব্দুল্লাহ ক্লান্ত-ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। উদ্দেশ্য এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে পুনরায় যাত্রা করা।

বুড়ো ক্বাসেম গোলদার আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়েই ব্যস্ত হয়ে তার কদমবুসি করার জন্য অগ্রসর হ’ল। পথ চলতে চলতে হঠাৎ সাপ দেখে মানুষ যেভাবে আঁতকে উঠে এক পাশে সরে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে আব্দুল্লাহ সরে দাঁড়াল। ক্বাসেম গোলদারের মনে হ’ল, অল্পের জন্য জান্নাতের দুয়ারের চাবি তার হাতের কাছ থেকে সরে গেল। সে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলল, ‘আমাদেরকে কি পায়ে ঠেললেন হুযূর?’ আব্দুল্লাহ জবাব দিল, ‘আপনি আমার মুরুব্বী, তাই আমারই উচিত আপনার কদমবুসি করা’। শুনে ক্বাসেম গোলদার তওবা তওবা বলতে লাগল এবং বলল, ‘আমাদেরকে আর গোনাহগার করবেন না হুযূর। আপনি যে বংশে জন্মেছেন, সে বংশের একজন বালকের পদধূলি পেলেও আমাদের জান্নাতের পথ খোলাসা হয়ে যায়’।

প্রসংগ পাল্টানোর জন্য আব্দুল্লাহ বলল, 'দেখুন! আমি খুবই ক্লান্ত। আগে আমার একটু বিশ্রামের দরকার'। তখন বুড়ো ক্বাসেম গোলদার পানি নিয়ে আনো, পাখা আনো ইত্যাদি বলে হাকডাক শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওযূর পানি এলো, পাখাও আনা হ'ল। ওযূর পর একটি সুন্দর ঘরে আব্দুল্লাহকে বসিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লোক নিয়োজিত হ'ল। উপস্থিত মোরগের গোশত দিয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু রাতের জন্য একটি খাসী জবাই করা হ'ল এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দাওয়াত করা হ'ল। গ্রামবাসী সকলে আব্দুল্লাহর পিতার মুরীদ। পিতার অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ই তার স্থলাভিষিক্ত। অন্ততঃ মুরীদগণ আব্দুল্লাহ্কে মনে মনে সেই আসনে বসিয়েছে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া বেশ সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হ'ল। ক্বাসেম গোলদার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসল। আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে ক্বাসেম বলল, হুযূর আপনাদের পূর্বপুরুষ সুদূর আরব থেকে মাছের পীঠে চড়ে এদেশে এসেছিলেন। তাই তাকে 'মাহী সওয়ার' বলা হ'ত। তাঁর কেরামতির কথা লোকের মুখে মুখে। নদীতে নৌকা ডুবে গেলে তিনি বৈঠকখানায় বসে থেকে তা টেনে তুলতেন। ফলে তার আস্তীন ভিজে যেত। হাতে কিছু খাবার নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে 'আও আও' করলে লক্ষ লক্ষ কবুতর এসে জমা হ'ত। তিনি সেগুলিকে ঐভাবে খাওয়াতেন। আব্দুল্লাহ অতি মনোযোগ সহকারে বৃদ্ধ ভক্তের কথাগুলি শুনছিল।

এক সময় ক্বাসেম বলল, হুযূর! আপনাদের বংশে সবাই কামেল পীর হয়েই জন্মায়। এক পীর নিজ হাতে একটি কাঁঠাল গাছ রোপণ করে সেবা-যত্নে সেটি বড় করেছেন। গাছে প্রথমবার মাত্র একটি কাঁঠালই ধরেছে। পীর মনে মনে স্থির করেছেন, কাঁঠালটি তিনি খাবেন। তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার এক নাবালক ছেলে কাঁঠালটি খেয়ে ফেলে। বাড়ী এসেই তিনি কাঁঠালের খোঁজে যান। দেখেন, গাছে কাঁঠাল নেই। তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে যান। ফলে কেউ বলে না, কাঁঠাল কে খেয়েছে। ঐ নাবালক ছেলের বিমাতার কাছ থেকে পীর জানতে পারলেন, কাঁঠালটি কে খেয়েছে। পীর ছেলেকে ডাকলেন। ছেলে এলে পিতা বললেন, 'তুমি কাঁঠাল খেয়েছ কেন?' ছেলে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে জবাব দিল, 'কেন, আব্বা, গাছের কাঁঠাল তো গাছেই আছে'। পিতা তখন পুনরায় গাছের কাছে গিয়ে বিস্মিত নয়নে দেখলেন, সত্যিই তো কাঁঠাল

গাছেই রয়েছে। পিতার বুঝতে বাকী রইল না। তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'কিয়া, এক ঘরমে দো পীর? যাও বাছা শুয়ে রও'। বাছা সেই যে শুইল। আর উঠল না।

আব্দুল্লাহ তার পিতার মুরীদের পীরদের কেরামতির অতিরঞ্জিত গল্প শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। আর একটা ভাবনা তার মনকে আলোড়িত করতে থাকল যে, পুত্রের পীরগিরিতে পিতার হিংসার কাহিনী তারা কিভাবে ব্যক্ত করতে পারে! আর এহেন পীরকে তারা মাথায় নিয়ে জান্নাতের পথ খোলাসা করতে চায়!

শিক্ষা : তথাকথিত পীররা মিথ্যা কেরামতির দোহাই দিয়ে মুরীদদের ঈমান হরণ করে। অতএব এদের থেকে সাবধান।

২৭. সম্পদের মোহ

সম্পদের মোহ মানুষের জন্মগত। সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কেননা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আবার সম্পদের অত্যধিক মোহ মানুষের জন্য চরম দুর্ভোগ ও অশান্তির কারণও বটে। সম্পদের মোহ মানুষকে ধ্বংসের চোরাগলিতে নিয়ে যায়। সম্পদ সংগ্রহে কখনো কখনো মানুষ অন্যায় পথে পা বাড়ায়। মানুষের সম্পদ প্রাপ্তির আকাংখার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সে যতই পায়, ততই চায়। ক্ষুধা নিবারণের পর অতি লোভনীয় খাবার গ্রহণে মানুষের অনিচ্ছা প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু যদি কোন মানুষের সামনে অগণিত সম্পদ রেখে দিয়ে বলা হয়, এ থেকে তোমার প্রয়োজন মতো গ্রহণ কর। তাহলে দেখা যাবে, সে তখন তার বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত সম্পদ আগলে নিয়ে বসে রয়েছে।

এক বাদশাহ অফুরন্ত সম্পদের মালিক। তিনি তার সে সম্পদ একটি ঘরে সংগোপনে সংরক্ষিত রেখেছেন। মাঝে মাঝে সে সম্পদ দেখার জন্য একাকী তিনি সেখানে যান। সম্পদ দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যায়, মনও ভরে যায়। তিনি সব ঠিকঠাক দেখে প্রশান্তি অনুভব করেন এবং মনে মনে বলেন, তিনি

যদি একাধারে এ সম্পদ ব্যয় করেন তাহলে বিশ হাযার বছরেও ফুরাবে না। তিনি মনে মনে এও আশা করেন, এ সম্পদ তাকে বিশ হাযার বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

এক রাতে তিনি সম্পদ দেখে মনে প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে গোপন ঘরের তালা খুলে সেটি বাইরে রেখে দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছেন আনমনে। এমন সময় তার একমাত্র শাহযাদা কি প্রয়োজনে যেন সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে তালাটি বাইরে দেখে ভাবল, তার বাবা হয়তো তালাটি খুলে লাগাতে ভুলে গেছেন। তখন সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ বাইরে আসার জন্য দরজার কাছে এলেন। কিন্তু তিনি আর বের হ'তে পারলেন না। ঘরটি এমন গোপনীয় ও সুরক্ষিত যে, ভিতর থেকে শত ডাকাডাকি করলেও কোন শব্দ বাইরে বের হয় না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ঘরেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্পদ মানুষকে বাঁচায়, কিন্তু সরাসরি বাঁচায় না। ঘরে সম্পদের ছড়াছড়ি অথচ একটুও খাদ্য নেই। অনাহারে তাকে মরতে হ'ল।

এদিকে রাজবাড়ীতে বাদশাহকে না পেয়ে স্ত্রী-পুত্র মনে করল, তিনি হয়তো কোথাও গিয়েছেন। তারা সম্ভাব্য স্থানসমূহে খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। রাজকার্য পরিচালনা করতে মন্ত্রীবর্গ শাহযাদাকে রাজমুকুট পরিয়ে সসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। রাজকার্য পরিচালনা করতে সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল। বাদশাহ নিখোঁজ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ধন-ভাণ্ডারের তালা খোলার সাথে সাথে এক বীভৎস গন্ধে চারিদিক ভরে গেল। দেখা গেল, বাদশাহ-ই স্বয়ং মরে পচে রয়েছেন। ধুলা ধূসরিত তার নিথর-নিস্তব্ধ-অসাড় দেহ।

শিক্ষা : মাত্রাতিরিক্ত সম্পদের নেশা মানুষকে বিবেক-বোধহীন পশুতে পরিণত করে। ফলে সে হালাল-হারাম বিবেচনা না করে শুধু দু'হাতে সম্পদ উপার্জন করতে থাকে। অথচ সে চিন্তা করে না যে, মৃত্যু বরণের সাথে সাথে সেই সম্পদ একটি মুহূর্তের জন্যও তার কোন কাজে আসবে না।

২৮. তিন লোভী ডাকাত

একবার একদল লোক বিপুল স্বর্ণমুদ্রা ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে তিন জন ডাকাতের খপ্পরে পড়ে নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে তারা রিক্ত হস্তে বাড়ী ফেরে। ডাকাত তিন জন বিপুল স্বর্ণমুদ্রা ও টাকা-কড়ি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। চলতে থাকে নানা পরিকল্পনা। সম্পদ বণ্টনের নীলনকশা।

এমন সময় ডাকাত সর্দার বলল, আমরা ক্ষুধার্ত। আগে ক্ষুধা নিবারণ করি। তারপর সম্পদ বণ্টন হবে। অতএব সর্বাগ্রে বাজার থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসা হৌক। ডাকাতের একজন তখন খাদ্য ক্রয়ের অনুমতি চাইলে সর্দার তাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সে বাজারে রওয়ানা হ'ল। পথে যেতে যেতে সে ঐ ছিনতাইকৃত স্বর্ণমুদ্রা ও অর্থ-কড়ি কি করে একাই ভোগ করা যায় সে পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করল যে, খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দুই বন্ধুকে হত্যা করব। তখন সব সম্পদই আমার হয়ে যাবে। বাকী জীবন এই সম্পদ দিয়ে সানন্দে কেটে যাবে। মুছে যাবে দুঃখ-দুর্দশা। বউ-বাচ্চা নিয়ে খেয়ে পরে ভালভাবেই দিনাতিপাত করতে পারব। সম্পদের এই মোহে পড়ে সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বাজার থেকে ফিরে আসছে।

অপরদিকে ঐ দুইজন চিন্তা করল যে, এতগুলো সম্পদ দুই বন্ধুর মধ্যে বণ্টন করতে পারলে পরিমাণে বেশী হবে। তারা স্থির করল যে, খাদ্য নিয়ে আসা মাত্রই তাকে হত্যা করব। তখন সমস্ত সম্পদ দুই বন্ধু ভাগ করে নিব। কথামতো অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকল তারা। খাদ্য নিয়ে সে ফিরা মাত্রই অপেক্ষমাণ দুই বন্ধু অস্ত্রাঘাত করে তাকে শেষ করে ফেলল।

এবারে অবশিষ্ট দুই ডাকাতের মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী ছিল সে চিন্তা করল, যদি আমি একাই এই বিশাল ধন ভাণ্ডারের মালিক হই তবে আমার চেয়ে আর কে ধনবান হতে পারে? আমার জীবন ধন্য হবে। সমস্যা দূরীভূত হবে। দারিদ্র্য বিমোচিত হবে। জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না। এই দুরভিসন্ধি অনুযায়ী অপর সাথীকে সে হত্যা করে ফেলল। পর পর দুই সাথীকে হত্যা করে সে আনন্দে উদ্বেলিত। তার লোলুপ দু'চোখ অপলক নেত্রে তাকিয়ে

আছে ছিনতাইকৃত সম্পদের দিকে। একাই এত সম্পদের মালিক, এই আনন্দে সে পাগলপারা। সাথীদ্বয়কে হত্যা করে স্বভাবতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। সামনে খাবার মওজুদ। ভাবল, আগে ক্ষুধা মিটিয়ে নেই, তারপর সম্পদ নিয়ে বাড়ী ফিরব। অতঃপর প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি ঘটল, যখন সে বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাল।

শিক্ষা : অত্যধিক সম্পদের লোভ মানুষকে ধ্বংস করে।

২৯. জনৈক মহিলা ও সোনার ডিম

এক মহিলার একটি মুরগী প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়ত। মহিলা মনে মনে বুদ্ধি আঁটল, আমি যদি তার খাবার বেশি করে দেই তাহলে সে প্রতিদিন দু'টি করে ডিম পাড়বে। অতঃপর সে যখন তার খাবার বৃদ্ধি করে দিল, তখন পাকস্থলী ফেটে মুরগীটি মরে গেল।

শিক্ষা : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

৩০. সবল ও দুর্বল বিড়াল

এক গরীব বুড়ির একটি দুর্বল বিড়াল ছিল। বুড়ির আহারের দু'লোকমা খেয়ে সে বেঁচে থাকতো। একদিন কষ্ট করে ঘরের চালে উঠে পাশের বাড়ির এক মোটা-তাজা বিড়ালকে চলাফেরা করতে দেখে বলল, ও ভাই! তুমি এত মোটা-তাজা হলে কী করে? মোটা বিড়ালটি জবাব দিল, এই বান্দা প্রতিদিন শাহী মহলে যাতায়াত করে। সেখানে চুরি করে পোলাও কোরমাতে ভাগ বসায়, আর কিছুটা অন্য সময়ের জন্য নিয়েও আসে। দুর্বল বিড়ালটি শাহী দস্তরখানের মজাদার খাবারের কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়ল। খুব বিনয়ের সুরে সবল বিড়ালকে বলল, ভাই প্রতিবেশীর হক আদায় করা তোমার কর্তব্য। তুমি নিজে প্রত্যেকদিন শাহী দস্তরখানের স্বাদ লুটবে আর আমি কিছুই পাব না- একি ইনছাফের কথা!

সবল বিড়ালটি বলল, ভাই আমাকে এত কৃপণ মনে কর না। তোমাকে আমার খাবারে অংশীদার করতে কোন আপত্তি নেই। আমার সাথে আগামীকাল যেও। পরদিন সবল বিড়ালের সাথে দুর্বল বিড়ালটি শাহী মহলে গেল। ওদিকে এরই

মধ্যে দস্তরখানের আশপাশে বিড়ালের ভিড় বেড়ে যাওয়ায় বাদশাহ তীরন্দায নিযুক্ত করে বিড়াল আসামাত্রই তীর ছুড়ে মারার নির্দেশ দিলেন। দুর্বল বিড়ালটি যখন শাহী মহলের কাছে আসল এবং রাজকীয় খাবারের ঘ্রাণ পেয়ে জিভ বের করল, অমনি রক্ষীরা তাকে তীর মেরে জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিলো।

শিক্ষা : অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

৩১. লোভী শিয়াল ও ঢোল

একটি শিয়াল শিকারের খোঁজে ফিরছিল। পথে একটি মোরগকে কিছু খুঁটে খেতে দেখতে পেল। সে মোরগটিকে ধরতে যাবে এমন সময় ঢোলের আওয়ায শুনতে পেলো। ঢোলটিকে কোন ব্যক্তি গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিল। বাতাসের কারণে গাছের ডালের আঘাতে তা থেকে আওয়ায বের হচ্ছিল। শিয়াল লক্ষ্য করল যে, মোরগের চেয়ে ঢোলের দেহটি বেশ মোটা ও নাদুসনুদুস। তাই বেশি পাওয়ার লোভে সে মোরগ ছেড়ে ঢোলের দিকে এগিয়ে চলল। অনেক কষ্টে গাছে উঠে ঢোলটি নামিয়ে এনে দেখল, তাতে কাঠ এবং চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই যে কথায় বলে, 'দূরের বাদ্য শুনতে মধুর'। শিয়ালেরও তাই হ'ল। ওদিকে মোরগও ততক্ষণে চলে গেছে। সুতরাং আক্ষেপ করা ছাড়া শিয়ালের ভাগ্যে আর কিছুই জুটল না।

শিক্ষা : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩২. শিকারী ও বাঘ

এক শিকারী শিয়ালের গর্তের নিকট এক মস্ত বড় কূপ খনন করে তার উপর ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে গোশতের কিছু টুকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছিল। শিয়াল গোশতের গন্ধ শুঁকেই শিকারীর কুমতলব আঁচ করতে পারল। কিন্তু এক সবল বাঘ সেই গোশত খাওয়ার লোভে সেই গর্তে পড়ে গেল। শব্দ শুনে শিকারী দৌড়ে গিয়ে শিয়াল মনে করে সেই গর্তে লাফিয়ে পড়ল। সুযোগ পেয়ে বাঘ তার পেট চিড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিল।

শিক্ষা : অত্যধিক লোভ মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়।

৩৩. লোভী বণিক

বাদশাহ হারূণুর রশীদ নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এক অন্ধ ফকীর তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। তিনি ফকীরকে ভিক্ষা দিলেন। ফকীর ভিক্ষা পাবার পর স্বীয় কপালে সজোরে আঘাত করতে বলল। বাদশাহ আঘাত করতে ইতস্ততঃ করলে ফকীর বলল, কপালে আঘাত না করলে দান ফিরিয়ে নিন। বাদশাহ অগত্যা তার কপালে মৃদু আঘাত করলেন। বাদশাহ বুঝলেন, এ ফকীরের নিশ্চয়ই কিছু জীবনেতিহাস আছে। তাই তিনি দরবারে এসে ফকীরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভিক্ষা পাবার পর কপালে আঘাত করতে বললে কেন?'

ফকীর তখন তার জীবনের ঘটনা বলতে শুরু করল। ফকীর বলল, 'আমি এই বাগদাদ শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলাম। ব্যবসা পরিচালনার জন্য আমার ৪০টি উট ছিল। একদিন আমি ৪০টি উটে মাল বোঝাই করে দূরের এক শহরে মাল বিক্রি করে ফিরছিলাম। দেখলাম, পথে একটি গাছের ছায়ায় একজন ফকীর বসে আছে। আমিও খাবার জন্য ঐ গাছের নীচে বসলাম। আমরা দু'জনে মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ফকীরের সাথে আমার কিছুটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হল। ফকীর বলল, সামনের ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রচুর গুপ্তধন রয়েছে। আমি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি এর সন্ধান জানে না। ফকীরের সাথে চুক্তি হ'ল যে, সে ২০টি উটে মাল বোঝাই করবে আর আমি ২০টি উটে মাল বোঝাই করব। অতঃপর আমরা দু'জনে উটগুলি নিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম এবং সুড়ঙ্গ পথে উটগুলি প্রবেশ করিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলাম। ইত্যবসরে সেখানে এত সম্পদ স্তূপীকৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, ২০টি কেন ১০০টি উটও তা বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না।

অতঃপর আমি ২০টি উটে মাল বোঝাই করলাম। ফকীরও ২০টি উটে মাল বোঝাই করল। হঠাৎ দেখলাম, ফকীর কৌটার মত কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল। আমরা বের হয়ে এলাম। পথ চলতে চলতে আমার মনে হ'তে লাগল, এ ভাগ ঠিক হয়নি। তাই আমি ফকীরকে বললাম, তুমি ফকীর মানুষ, এত সম্পদ দিয়ে তুমি কি করবে? আমাকে ১০টি উট ফিরিয়ে দাও। ফকীর

তৎক্ষণাৎ ১০টি উট দিল। একটু পরে আবার আমার মনে হ'তে লাগল, ফকীরের অর্থের কি প্রয়োজন আছে? তাই পুনরায় তাকে বললাম, তুমি সংসারত্যাগী ফকীর। তোমার অর্থের কি দরকার? অবশিষ্ট ১০টি উট আমাকে দিয়ে দাও। ফকীর মোটেও আপত্তি করল না। আমি ৪০টি উট নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। ফকীর এত সহজেই আমাকে সবগুলি উট ফিরিয়ে দিল কেন? আমার মনে হ'ল, ফকীর যে কৌটাটা কুড়িয়ে পেয়েছে নিশ্চয়ই এর কিছু তাৎপর্য আছে। আমি ঐ কৌটার বিষয় জানতে ফকীরের নিকট ফিরে আসলাম এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ফকীর বলল, এই কৌটায় এক প্রকার মলম রয়েছে। যা ডান চোখে লাগালে মাটির অভ্যন্তরে কোথায় কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে তা স্পষ্ট দেখা যাবে। আবার বাম চোখে লাগালে সাথে সাথে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। কোন কিছুতেই তাকে আর ভাল করা যাবে না।

পরীক্ষা স্বরূপ আমি ফকীরকে আমার ডান চোখে মলম লাগিয়ে দিতে বললাম। মলম লাগানোর পর মাটির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সম্পদ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এখন আমার মনে হ'ল, বাম চোখে মলম লাগালে ফল আরো ভাল হবে। তাই আমি আমার বাম চোখেও মলম লাগাতে বললাম। ফকীর রাযী হচ্ছিল না। কিন্তু কেন যেন আমার যিদ চেপে বসল। আমার পীড়াপীড়িতে ফকীর বাম চোখে মলম লাগিয়ে দিল। সাথে সাথে আমি দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমি অন্ধ হয়ে পথে বসে রইলাম। এদিকে ফকীর আমার সব উট নিয়ে চলে গেল। এই বাগদাদেরই কতিপয় বণিক ঐ পথে ফিরছিল। আমার এই অবস্থার কারণ জানতে পেরে তারা আমাকে শহরে পৌঁছে দিল।

অতঃপর আমার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এল। কিন্তু আত্মহত্যা করতেও পারলাম না। আমার এই পরিণতির জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। নিজ কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে কপালে আঘাত গ্রহণ সাব্যস্ত করলাম। আঘাত না করলে কারো দান আমি গ্রহণ না করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হ'লাম।

শিক্ষা : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩৪. নেকড়ে ও খরগোশের শান্তিচুক্তি

নেকড়েদের নেতা একদিন জঙ্গলের খরগোশদের আমন্ত্রণ করল। অতঃপর তাদেরকে সুস্বাদু ভুরিভোজে আপ্যায়িত করার পরে বলল, তোমাদের সাথে আমাদের পুরানো শত্রুতার অবসান চাই। ব্যাঘ্রনেতাদের এই সন্ধি প্রস্তাবে খরগোশের দল আনন্দে নেচে উঠলো। তারা নেকড়েদের সঙ্গে চুক্তি করল যে, এখন থেকে জঙ্গলে সবাই পারস্পরিক নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করবে। ব্যাঘ্রনেতা তার দলের সদস্যদের বলে দিল, তারা যেন সবাই স্ব স্ব গর্তে বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, যাতে খরগোশেরা নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। অতঃপর নেকড়ে নেতা এসে খরগোশ নেতাকে এই সুখবর দিল। তাতে খরগোশ নেতা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, 'এখন থেকে আমরা সর্বদা আপনাদের সেবায় থাকব এবং অন্যান্য প্রাণী কে কোথায় গোপনে বাস করে তা বলে দেব, যাতে আপনারা সহজে তাদের ধরে খেতে পারেন'। নেকড়ে নেতা এতে ক্রূর হাসি হাসলো। যার মর্ম খরগোশ নেতার ছোট্ট মাথায় ঢোকেনি। খরগোশ নেতা তার দলকে গিয়ে এ খবর দিলে এবং সবাইকে বেরিয়ে এসে নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে বললে তাদের একজন বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ নেতা সাবধান করে দিয়ে বলল, 'নেকড়েদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি চুক্তি? এতো স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নয়'। কিন্তু কে শোনে কার কথা? স্বাধীনতার আনন্দে সবাই নাচতে নাচতে ও গান গাইতে গাইতে দলে দলে বাইরে চলে এলো।

অন্যদিকে নেকড়ে নেতার কাছে খরগোশ নেতার দেওয়া ওয়াদা এবং অন্যান্য প্রাণীদের গোপন বাসার খবর বলে দেওয়ার কথা পাখিরা সারা জঙ্গলে রটিয়ে দিল। তাতে সবাই হুঁশিয়ার হয়ে গেল এবং খরগোশদের বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার দিল ও তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে খরগোশের দল সবাই বাইরে এসে জমা হয়েছে এবং ফূর্তিতে নাচগানে মত্ত হয়ে গেছে। এ সময় নেকড়ে নেতা তার দলকে ইঙ্গিত দিল। যার অর্থ কেবল তারাই বোঝে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চারদিক দিয়ে এসে খরগোশ দলকে ঘিরে ফেলল এবং এক একটাকে টপাটপ ধরে ঘাড় মটকাতে লাগলো। খরগোশের দল তখন অন্যান্য প্রাণীদের সাহায্যে চেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচিৎকার করতে লাগল। কিন্তু তাতে কেউ সাড়া দিল না। বলা হয়ে থাকে যে, সেদিন থেকেই

খরগোশের দল তাদের পিতৃপুরুষদের বোকামিতে লজ্জিত হয়ে অধোবদনে হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে চলাফেরা করে। তারা আর কখনোই নেকড়েদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির কল্পনাও করে না। তারা অন্যান্য প্রাণীদের সাথে সন্ধি ও মীমাংসা করতে চায়। কিন্তু তাদের কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। ফলে তাদের দুর্বিষহ একঘরে জীবন কপালের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা : মুনাফেকী ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম এমন নির্মমই হয়ে থাকে।

৩৫. অকৃতজ্ঞের পরিণাম

বিশাল এক বন। সে বনের পাশেই ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। সে গ্রামে বাস করত এক গরীব কাঠুরে। সে বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে চাল-ডাল কিনে বাড়ী ফিরত। এভাবেই দু'বেলা খেয়ে আবার কখনও উপোস থেকে তাদের দিন চলত। গরীব কাঠুরে ও তার পরিবারের লোকেরা ছিল খুবই ধার্মিক। তারা কখনও ছালাত-ছিয়াম কাযা করত না। দু'বেলা খেয়ে আবার কখনও উপোস থেকেও তারা কখনও নিজেদেরকে অসুখী মনে করত না। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গেল। কিন্তু বনের মধ্যে ঢুকে নিকটে কোথাও কাটার উপযোগী কোন কাঠ পেল না। ফলে মাইল খানেক হেঁটে বনের গভীরে গিয়ে সেখানে বেশ কাঠ পেল। তা কেটে নিয়ে গ্রামের বাজারের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছু দূর এগোতেই ভীষণ এক গর্জন শুনতে পেল। ভয়ে কাঠুরের বুক হিম হয়ে গেল। কারণ একটা নদী এই বনকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। আর নদীর ওপারে রয়েছে অনেক বাঘ। অনেক সময় বাঘ নদী পার হয়ে এসে কাঠুরে ও শিকারীদের ওপর হামলা করে।

কাঠুরে শব্দটি পুনরায় শুনতে পেল। কিন্তু তার নিকট শব্দটি বড় করুণ বলে মনে হ'ল। সে লক্ষ্য করল, তার বাম পাশে গজ পনের দূরে ছোটখাট একটি ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে শব্দটি আসছে। কাঠুরে মাথার বোঝা মাটিতে রেখে কুঠারটি সামনে বাগিয়ে এগিয়ে চলল। অতঃপর ঝোপের নিকটে পৌঁছে দেখল বিশাল একটা শিয়াল ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে সেখানে কাতরাচ্ছে। শিয়ালটিকে দেখে কাঠুরের বড় মায়া হ'ল। সে কিছু ওষধি গাছের ছাল ও পাতা বেটে তার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিল এবং তার সামনে কিছু খাবার রেখে

চলে আসল। পরের দিন আবার কাঠুরে বনে গেল। কিন্তু সেদিন সে শিয়ালটিকে কোথাও দেখতে পেল না।

মাস খানেক পরে একদিন সকাল বেলা কাঠুরে বনে গেল। কিন্তু এদিন বনের অনেক ভিতরে গিয়েও কাটার উপযোগী কোন কাঠ পেল না। তাই বনের গভীরে এসে যা পেল তা নিয়ে গ্রামের বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ তার সামনে বড় একটি ছোরা হাতে উপস্থিত হ'ল এক বনদস্যু।

এই বনদস্যু পাশের গ্রামে বাস করে। একদিন অসুস্থ অবস্থায় সে বনের মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। কাঠুরে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্ন করে। সুস্থ হয়ে সে কাঠুরের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় তাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে গরীব কাঠুরে গ্রামের সর্দারের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। সর্দার তাকে বলল, কাঠুরে তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় পেয়ে সেবা করে তোমার অনেক বড় উপকার করেছে। আর তুমি উপকারীর অপকার করে ভীষণ অপরাধ করেছ। তাই তোমার শাস্তি হওয়া আবশ্যক। সর্দারের হুকুমে তার একটি হাত কেটে নেওয়া হয়। সেদিন থেকেই সে কাঠুরেকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এদিন যেহেতু কাঠুরে বনের গভীরে এসেছে, এখানে তাকে মারলে সবাই মনে করবে কাঠুরেকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তাই সে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। কাঠুরেকে বলল, কাঠুরে! তুই তোর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নে। তোকে আজ আমার হাতে মরতেই হবে। সে কাঠুরেকে কথাগুলি বলছে আর ছুরি বাগিয়ে সামনের দিকে এক পা দুই পা করে এগিয়ে আসছে। কাঠুরেও এক পা দুই পা করে পিছাচ্ছে। এমন বিপদের সময়ও কাঠুরে সাহস হারাল না। কাঠুরে বলল, দস্যু! আল্লাহ যদি না চান তবে তুই কেন পৃথিবীর কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না। একথা শুনে সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রূর হাসি হেসে উঠে বলল, আজ তোকে আমার হাত থেকে তোর আল্লাহও বাঁচাতে পারবে না (*নাঊযুবিল্লাহ*)। কাঠুরে মনে মনে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল। পিছাতে পিছাতে কাঠুরের পিঠ একটি গাছের সাথে লেগে গেল। দস্যুও কাঠুরেকে মারার জন্য ছুরি তাক করল। এমন সময় হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ গতিতে একটি শিয়াল ঐ দস্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সাথে আরো পাঁচ-ছ'টি শিয়াল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠুরে লক্ষ্য

করল, প্রথম যে শিয়ালটি ঐ দস্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটি ঐ শিয়াল, কাঠুরে যার সেবা করেছিল। অতঃপর কাঠুরে আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং মনে মনে বলল, অকৃতজ্ঞের পরিণাম আল্লাহ এমনই করেন।

শিক্ষা : আল্লাহ্র হাতেই সকল কিছুর ক্ষমতা। আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে এমন কেউ নেই যে তার উপকার করতে পারে। আবার আল্লাহ কারো উপকার করতে চাইলেও পৃথিবীর কোন শক্তি তার সামান্যতম ক্ষতি সাধন করতে পারে না *(আন'আম ১৭-১৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২)*। কাজেই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা এবং বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে তোমাদেরকে অধিক দান করব' *(ইবরাহীম ৭)*।

৩৬. পশুর কৃতজ্ঞতাবোধ

স্নেহ-দয়া-মায়া-ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি আল্লাহপাক কেবল উন্নত জীব মানুষকেই দান করেননি। ইতর প্রাণী পশু-পাখিতেও দিয়েছেন। তাই মানুষ যেমন অতি আদর-যত্নে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করে, পশু-পাখিও এদিক দিয়ে কম নয়। তারাও সহজেই মানুষের আদর-সোহাগ বুঝতে পারে।

এক ক্রীতদাস তার মনিবের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এক বনে ঢুকে পড়ে। বনের ভিতর দিয়েই পথ চলতে চলতে সে দেখতে পেল, একটি সিংহ একস্থানে স্থির হয়ে তার দিকে একটি পা বার বার উঠিয়ে কি যেন ইশারা করছে। সে সিংহটিকে অসুস্থ মনে করল। সিংহের ইশারায় সে সাহসে বুক বেঁধে আস্তে আস্তে সিংহের কাছে গেল। সে দেখল, সিংহের পায়ে একটি বড় কাঁটা বিঁধে রয়েছে। ফলে পা-টি ফুলে গেছে। সে পা থেকে কাঁটাটি বের করল। তারপর পথ চলতে লাগল।

এর কিছুদিন পর পলাতক ক্রীতদাসটি ধরা পড়ে গেল। আর ঐ সিংহটিও ধরা পড়েছে। ধৃত সিংহটি একটি সার্কাস পার্টির হাতে এসে পড়ল। যে শহর থেকে লোকটি পালিয়েছিল, সার্কাস পার্টি ঐ শহরে এল সার্কাস দেখাতে।

শহরের বিচারকমণ্ডলী পলাতকের অপরাধের শাস্তি হিসাবে ঐ সিংহকে দিয়ে তাকে ভক্ষণ করানো স্থির করল। তাহলে এটি একটি দৃষ্টান্ত হবে, যাতে আর কোন ক্রীতদাস এভাবে পালিয়ে না যায়। বিচার ব্যবস্থা নির্মম মনে হলেও সে যুগে সেটি মোটেই নির্মম ছিল না। যাহোক তারা ঘোষণা দিল, অমুক দিন অমুক সময় পলাতককে সিংহের সামনে নিক্ষেপ করা হবে। কিভাবে সিংহ তাকে ভক্ষণ করে, এ দৃশ্য দেখতে প্রচুর উৎসুক দর্শক উপস্থিত হ'ল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। মাঝখানে পলাতক লোকটি। এখন সিংহটিকে শিকল লাগিয়ে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সবাই ভাবছিল ছাড়া পেয়ে সিংহটি আক্রমণাত্মকভাবে দৌড়ে তাকে শেষ করে দিবে। কিন্তু একি! সবাইকে বিস্মিত করে সিংহটি তাকে খেল না। বরং পলাতককে সে সঠিকভাবেই চিনল। সে-ই তার পা থেকে কাঁটা বের করে দিয়েছিল।

শিক্ষা : একটি ইতর প্রাণী তার পা থেকে কাঁটা বের করার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। আর আমরা মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়ে কৃতজ্ঞতার বদলে যত রকম অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে মোটেই কার্পণ্য করি না। এটা কি আমাদের চরিত্র হওয়া উচিত?

৩৭. অপূর্ব প্রতিদান

এ বিশ্ব চরাচরে মানুষ এসেছে নিজেদের সুন্দর কর্ম দ্বারা এ ধরণীকে আরো সুন্দর করতে। আর তার উত্তম কর্মের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ করতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে মানুষ তার আসল কর্তব্যকে ভুলে গেছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ হয়েছে ভোগবাদী। তবে এ জগৎ-সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাদের জীবনটা ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

নাবীল পিতৃ-মাতৃহীন এক অনাথ বালক। শৈশবে পিতামাতা মারা যাওয়ার পর চাচার অপত্য স্নেহে সে লালিত-পালিত হয়েছে। দিনমজুর পুত্রহীন আবিদ মৃত ভাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ভাতিজাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করে বড় করেছে। নিজের সহায়-সম্বল যা ছিল সব ব্যয় করে ভাতিজাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আজ নাবীল শিক্ষিত যুবক। আবিদ ছাহেব চান নাবীল ভাল কোন চাকুরী পাক এবং তার ছোট মেয়েকে বিবাহ করুক। কিন্তু একথা তিনি সরাসরি নাবীলকে

কখনও বলেননি। তবে নাবীলের কানে কথাটা যেকোন ভাবে পৌঁছেছে। এমএ পাশ করার পর কয়েক বছর কেটে গেছে। কোন চাকুরী সে পায়নি। ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়িয়ে সে বেশ টাকা উপার্জন করে। এতে চার সদস্যের চাচার সংসার ভালই কেটে যাচ্ছে। নতুন ঘর করেছে। তিন বেলা খাবার জন্য আর চিন্তা করতে হয় না। সবার পরনে মানানসই পোশাক শোভা পায়। তারপরও স্থায়ী কোন চাকুরী নয় বলে সে বিয়ের কথা ভাবে না। ইতিমধ্যে তার চাচা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নাবীলকে ডেকে বলেন, বাবা! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার বোন আসমাকে পাত্রস্থ করে যেতে পারলাম না। ওকে একটা যোগ্য পাত্রে তুলে দিয়ে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারতাম। চাচার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে নাবীল মনে মনে রাযী হয়ে যায়। কারণ মেয়ে হিসাবে আসমা খারাপ নয়। তাছাড়া ছোট থেকে তাকে দেখে এসেছে। তাই চাচীকে সে বলে, তোমাদের কোন ইচ্ছা থাকলে তোমরা তা পূরণের ব্যবস্থা কর, আমি অমত করব না। নাবীলের ভদ্রোচিত কথায় চাচী খুশি হন। একদিন শুভক্ষণে নাবীল-আসমার বিয়ে হয়। তারা এখন সুখী দম্পতি। বিয়ের ৩ বছরের মাথায় তাদের প্রথম সন্তান হয় লাবীব। বছর দুয়েক হ'ল নাবীল একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে ভাল সম্মানীতে চাকুরীও পেয়েছে। থাকে ঢাকায়। প্রতি মাসে বাড়ী আসে। চাচা-চাচী, স্ত্রী-পুত্র সবাইকে দেখে যায়। সবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিয়ে আবার ফিরে যায় কর্মস্থলে।

নাবীলের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কর্মস্পৃহা এবং সততায় মুগ্ধ কোম্পানীর মালিক। নাবীল আসার পর কোম্পানীর উন্নতিও হয়েছে কল্পনাতীত। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ম্যানেজ করার চমৎকার ক্ষমতা রয়েছে তার মাঝে। এজন্য যামান ছাহেব নাবীলকে নিয়ে ভাবতে থাকেন। যামান ছাহেব একমাত্র মেয়ে রায়হানাকে সখ করে বিয়ে দিয়েছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীর দুলালের সাথে। কিন্তু তার মাদকাসক্তি ও উচ্ছিন্নের কারণে যামান ছাহেব মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হন। তখন থেকে তিনি মনে মনে একটি চরিত্রবান ছেলেকে খুঁজছিলেন। এক্ষেত্রে নাবীলই তার প্রথম পসন্দের পাত্র। তিনি নাবীলের সার্বিক অবস্থা জেনেও নিজের মেয়েকে তার হাতে তুলে দিতে রাযী। এ বিষয়ে স্ত্রী এবং মেয়ের সাথে কথাও বলেছেন। মেয়ের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য কোম্পানীর কিছু বিষয় দেখার জন্য তাকে কিছু

দায়িত্বও দিয়ে রেখেছেন। তাই কাজের সুবাদে নাবীলের সাথে তার কিছুটা পরিচয় আছে বৈকি। এজন্য বাবার পসন্দে রায়হানা অমত করেনি।

যামান ছাহেব এক সময় নাবীলের গ্রামের বাড়ী চলে যান। কথা বলেন নাবীলের চাচার সাথে। যামান ছাহেবের পরিচয় পেয়ে আবিদ ভাতিজার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমত করেন না। কিন্তু এসব নাবীল জানতে পারেনি। এক সময় যামান ছাহেব নাবীলকে ডেকে বিষয়টি বললেন। নাবীল অমত করে। বলে যে, প্রয়োজনে আমি চাকুরী ছেড়ে দিতেও রাযী। কিন্তু এই অসম বিবাহ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার স্ত্রী-সন্তান সবই আছে। যামান ছাহেব তাকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কথা বলে বুঝানোর চেষ্টা করেন। এতে নাবীলের মন নরম হয়। সে কিছুদিন সময় চেয়ে নেয়। বাড়ি এসে চাচা-চাচীকে প্রথমে বলে। তারা বিষয়টি নাবীলের উপরে ছেড়ে দেয়। নাবীল স্ত্রীর কাছে বলে। আসমা তাকে বলে, পৃথিবীতে সবকিছুর ভাগ মানুষ দিতে পারে। কিন্তু নারী তার স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। শরী‘আতে যেহেতু একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, সেহেতু আমি আপনাকে নিষেধ করতে পারছি না। তবে আপনার হৃদয়ে আমার জন্য একটা জায়গা চাই; আমার সন্তানের জন্য চাই একটা নিরাপদ আশ্রয়। এসব থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই।

নাবীল কর্মস্থলে ফিরে আসে। মালিক তাকে আবার ডেকে এ বিষয়ে বলেন। তখন সে বলে, আমি দরিদ্র কর্মচারী মাত্র। আপনার মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই। যামান ছাহেব বলেন, তোমার সবকিছু জেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি অমত কর না। তোমার স্ত্রী-ছেলে কেউ অধিকার বঞ্চিত হবে না। তবে তুমি আরো কিছু সময় ভেবে দেখ। এদিকে রায়হানা তার মাকে নিয়ে চলে যায় নাবীলের বাড়ীতে। অনেক গল্প করার পর আসমাকে কথাটা বলে। আসমা শুধু বলে, বোন হিসাবে তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দেওয়ার সুযোগ পেলে এবং তোমাকে আমার পাশে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আসমার কথায় খুশিমনে রায়হানা ফিরে যায়। শুভক্ষণে যামান ছাহেব মেয়েকে তুলে দেন নাবীলের হাতে। এক সময় কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব সব বুঝিয়ে দেন নাবীলকে। অনেক দিন হয়ে যায়। রায়হানার কোন সন্তান হয় না। অনেক চিকিৎসা করেও কোন লাভ হয়নি। সে জানতে পারে যে, তার আর সন্তান হবে না। ওদিকে আসমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরীক্ষায় ধরা পড়ে তার দু'টি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তি করতে দেরী হয়ে গেছে অনেক। যরূরী অপারেশন করাতে হবে। কিন্তু আসমার রক্তের গ্রুপের সাথে কারো মিল পাওয়া যায় না। তার বড় বোনের রক্তের গ্রুপ মিলে গেলেও সে কিডনী দিতে রাযী নয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও কিডনী পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় জানা যায়, তার রক্তের গ্রুপের সাথে রায়হানার গ্রুপের মিল রয়েছে। সে একটা কিডনী দিতেও চায়। সবাই তাকে নিষেধ করে। কিন্তু কারো কথা সে মানতে নারায। সবার কথা উপেক্ষা করে সে একটা কিডনী আসমাকে দান করে। রায়হানা বলে, যে আমাকে তার স্বামীর অংশ দিয়েছে, আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে সহযোগিতা করেছে, আমার নির্জীব জীবনে সজীবতা এনে দিয়েছে, আমাকে বেঁচে থাকার পথ করে দিয়েছে, আমি তাকে আমার দেহের অংশ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম। তাছাড়া আমার চেয়ে আসমার বেঁচে থাকা বেশী দরকার। কেননা তার সন্তান আছে। আমার তো কেউ নেই।

শিক্ষা : কেউ কারো উপকার করলে সুযোগ মতো তারও উপকার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

৩৮. বুদ্ধিমান বিচারক

আলজেরিয়ার এক বাদশাহ্‌র নাম বাওয়াকাস। তিনি স্থির করলেন, তাঁর দেশের বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। তিনি শুনেছেন রাজধানীর বাইরে একজন বিজ্ঞ ন্যায়বিচারক আছেন। যিনি ন্যায়বিচার করতে কোন দ্বিধা করেন না। কোন দুষ্কৃতিকারীর কূটকৌশল কিংবা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাব তাকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে বাদশাহ ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একটি ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে রওনা হ'লেন। তাকে দেখে চেনার উপায় নেই যে, তিনি দেশের বাদশাহ। পথিমধ্যে এক খোঁড়া লোককে হাত তুলতে দেখে ঘোড়া থামালেন। লোকটি ভিক্ষা চাচ্ছে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে বাদশাহ ঘোড়ায় চড়তে যাবেন ঠিক তখনি ঘটল বিপত্তি।

ভিক্ষুক বাদশাহ্‌র কাপড় টেনে ধরল। বাদশাহ তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি বললেন, আর কি চাও তুমি? তোমাকে কি ভিক্ষা দেইনি? সে বলল, জি হ্যাঁ

দিয়েছেন। কিন্তু আমার আরেকটি উপকার করুন! আমাকে ঘোড়ায় তুলে মাইল খানেক পথ এগিয়ে দিন। এমনিতে হাঁটতে পারি না, গাড়ি-ঘোড়ার নীচে পড়ে কখন যে চ্যাপ্টা হয়ে যাই তার ঠিক নেই! বাদশাহ বড়ই দয়ালু। তিনি ভিক্ষুককে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলেন। মাইল খানেক যাবার পর ঘোড়া থামালেন। কিন্তু ভিক্ষুকের নামার কোন লক্ষণ না দেখে বললেন, নেমে পড়ো। ভিক্ষুক বলল, নামব কেন? এটাতো আমারই ঘোড়া। বদ মতলব ছেড়ে দাও, ব্যবসায়ী ভাই! নিজ ইচ্ছায় ঘোড়া না দিলে কোর্টে চলো। বাদশাহকে নিয়ে ভিক্ষুক কোর্টে হাযির হল।

দু'জনের যবানবন্দী শুনলেন বিচারক। রায় দিলেন ভিক্ষুকের পক্ষে। বাদশাহ হ'লেন ঘোড়া চোর। অগত্যা বাদশাহ ঘোড়াটি নিয়ে এলেন সেই ন্যায়বিচারকের দরবারে। অসংখ্য বিচারপ্রার্থী ও দর্শক-শ্রোতায় আদালত ঠাসা। তখন চলছিল অন্য একটি বিচার। একজন বুদ্ধিজীবি ও একজন কৃষককে দেখা গেল কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। দু'জনই এক সুন্দরী মহিলার স্বামী বলে দাবী করছে। কৃষক বলল, ঐ মহিলা আমার বিবাহিতা স্ত্রী। বুদ্ধিজীবি বললেন, না সে আমার স্ত্রী। সুন্দরী মহিলাটি বোবা ও অশিক্ষিত। বিচারক পড়লেন ভীষণ সমস্যায়। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, এই মহিলা আজ আমার কাছে থাকবে, আগামীকাল এর ফায়ছালা হবে। তারা চলে গেল।

কাঠগড়ায় উঠলো আরও দু'জন বিচারপ্রার্থী। একজন কসাই অন্যজন তেল বিক্রেতা। কসাইয়ের গায়ে ছিল রক্তমাখা পোশাক আর তেল বিক্রেতার গায়ে তেল চিটচিটে কাপড়। কসাইয়ের হাতে একটা টাকার থলে, আর তেল বিক্রেতা কসাইয়ের হাত শক্ত করে ধরে আছে। কসাই বলল, মাননীয় বিচারক! আমি এই লোকটির কাছ থেকে কিছু তেল কিনেছি, টাকা দেয়ার জন্য যেইনা এই থলেটি বের করেছি, অমনি এই তেল বিক্রেতা থলে সমেত টাকা ছিনতাই করার জন্য আমার হাত চেপে ধরেছে। তেল বিক্রেতা বলল, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা মহামান্য বিচারক। আমার কাছ থেকে এ কসাই তেল নেয়ার জন্য এলে আমি তাকে এক টিন তেল দেই। সে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেয়। তার ভাংতি চাইলে ভাংতি দেওয়ার জন্য এই থলে বের করে খুলি। তখন সে আমার হাত থেকে টাকার থলেটি নিয়ে দৌড় দেয়। ভাগ্যক্রমে আমি তাকে ধরতে পেরেছি। এর বিচার করুন। বিজ্ঞ বিচারক

একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, টাকার থলে আমার কাছে রেখে যাও। আগামীকাল রায় হবে।

এবার বিচারক ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের অভিযোগ শুনতে চাইলেন। যা কিছু ঘটেছে ব্যবসায়ী তার সবই বিচারককে বলল। ভিক্ষুক বলল, আমি খোঁড়া মানুষ। ঘোড়ায় চড়ে এদিক-সেদিক চলাফেরা করি। এই ব্যবসায়ী আমার ঘোড়া ছিনতাই করার মতলবে আমাকে পথিমধ্যে থামিয়ে দেয়। ঘোড়ায় চড়ে এখন উল্টো ওটা নিজের বলে দাবী করছে। একটু চিন্তা করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিচারক বললেন, ঘোড়া আমার কাছে রেখে চলে যাও, কাল বিচার হবে।

চাঞ্চল্যকর এই মামলা তিনটির রায় শুনার জন্য পরদিন অসংখ্য লোক আদালতের সামনে ভিড় জমাল। যখন বিচারক হাতুড়ি পেটালেন, তখন উৎসুক লোকের ফিসফিস শব্দ থেমে গেল। যথারীতি ডাক পড়ল সেই মহিলার স্বামী দাবীদার বুদ্ধিজীবি এবং কৃষকের। বিচারক রায় ঘোষণা করলেন। মহিলার প্রকৃত স্বামী হচ্ছে বুদ্ধিজীবি। প্রতারক কৃষককে ৫০ ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায় কার্যকর করা হ'ল। এবার এল কসাই আর তেল বিক্রেতার পালা। দু'জনেই কাঠগড়ায় হাযির। বিচারক আদেশ দিলেন টাকার থলেটি কসাইকে দেয়া হোক। আর ছিনতাইয়ের চেষ্টা করায় তেল বিক্রেতাকে মারা হোক ৫০টি বেত্রাঘাত। সবশেষে ডাক পড়ল ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের। বিচারক ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি আর বিশটি ঘোড়ার মধ্য থেকে তোমারটি আলাদা করতে পারবে? ব্যবসায়ী বলল, জি হ্যাঁ পারব। একই কথা বিচারক ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করলে সে আরও অধিক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই পারব। ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে বিচারক ঘোড়ার আস্তাবলে ঢুকলেন। সত্যি সত্যি ব্যবসায়ী ঘোড়া শনাক্ত করল।

এবার ভিক্ষুকের পালা। সেও ২০টি ঘোড়ার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট ঘোড়াটি চিনে ফেলল এবং হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিচারক এজলাসে এসে বসলেন। রায় শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জনতা। দৃপ্তকণ্ঠে রায় দিলেন বিচারক, ঘোড়া এই ব্যবসায়ীকে দেয়া হোক এবং ভিক্ষুককে ৫০ ঘা বেত মারা হোক। যথারীতি তাই হ'ল।

সেদিনের মত বিচার শেষ হ'ল। আদালত মুলতবি করা হ'ল। বিচারক বাসায় রওয়ানা হ'লেন। ব্যবসায়ীকে পিছু পিছু অনুসরণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আপনি কি আমার বিচারে সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি? ব্যবসায়ী বলল, আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু দয়া করে একটু বলবেন কি, কেমন করে বুঝতে পারলেন যে, ঐ বুদ্ধিজীবিই মহিলার স্বামী, কৃষক নয়? টাকাগুলো কসাইয়ের, তেল বিক্রেতার নয়? ঘোড়াটি আমার, ভিক্ষুকের নয়? বিচারক বললেন, আমি মহিলাকে কলমে কালি ঢুকাতে দিয়েছিলাম। মহিলা তৎক্ষণাৎ কলমটি পরিষ্কার করে দক্ষ হাতে দ্রুত কালি ভরে দিল। অবশ্যই একাজে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষকের স্ত্রী হ'লে তা সম্ভব হ'ত না।

আমি টাকাগুলো শনাক্ত করেছি এভাবে যে, একটি পাত্রে পানি ভর্তি করে তাতে টাকা ভিজিয়ে রেখে সতর্কভাবে খেয়াল করছিলাম, পানির উপর তেলের আস্তরণ পড়ে কি-না। তেল বিক্রেতার টাকা হ'লে হাতে নাড়া-চাড়ার কারণে কিছু তেল টাকায় লেগে থাকত। আর টাকা পানিতে ভিজিয়ে রাখায় তেল পানিতে ভেসে উঠত। কিন্তু তা হয়নি। অতএব কসাই সত্য বলেছিল। কিন্তু ঘোড়ার পাল থেকে ঘোড়া শনাক্তকরণ ছিল জটিল কাজ। আপনারা দু'জনই দক্ষ। ঘোড়া চিনতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি ঘোড়া কাকে চেনে। আপনি ঘোড়ার কাছে যাওয়া মাত্রই ঘোড়াটি মাথা ঘুরিয়ে আপনার দিকে এলো। কিন্তু ভিক্ষুক ঘোড়াটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পা উঠাল। সুতরাং বুঝতে পারলাম, ঘোড়ার মালিক কে হ'তে পারে।

ব্যবসায়ী এবার নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন। আমি আসলে ব্যবসায়ী নই, আলজেরিয়ার বাদশাহ বাওয়াকাস। দুর্নীতি আর আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আরো শুনেছি, দেশে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা নেই। তাই দেশের প্রকৃত অবস্থা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ছদ্মবেশে বের হয়েছি। কে বলে দেশে সুষ্ঠু বিচার উঠে গেছে?

আপনার মত একজন মহান ন্যায়বিচারককে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আজ আপনি কি চান? যা খুশি চাইতে পারেন। আপনাকে পুরস্কৃত করব। আবেগে আপ্লুত হয়ে বিচারক বললেন, আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই জাঁহাপনা, কেবল দো'আ করবেন। কিছুদিন পর বাদশাহ বাওয়াকাস প্রধান

বিচারপতি হিসাবে তাকে নিয়োগ দান করলেন। বিচারব্যবস্থা আরো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হ'ল। দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আইনের শাসন। ফিরে এলো শান্তি-খৃঙ্খলা।

শিক্ষা : ন্যায়বিচারের জন্য দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা অত্যন্ত যরূরী। একজন সৎ ও বিচক্ষণ বিচারপতির মাধ্যমে সমাজের শত অপরাধ দূরীভূত হয় এবং সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৯. কাযীর বিচার

অনেক দিন আগের কথা। শহর থেকে অনেক দূরে বাস করত একটি লোক। সে ছিল নেহায়েত গরীব। গায়ে খেটে ও বুদ্ধির জোরে সে বেশ টাকাকড়ি সঞ্চয় করেছিল। সে এক পরমা সুন্দরীকে বিয়ে করেছিল। একে একে তাদের তিনটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছিল। ছেলে তিনটি খুব সুদর্শন ছিল। ক্রমে তারা হয়ে ওঠে এক একজন সুঠামদেহী জওয়ান। ছেলে তিনটি কারবারে তাদের পিতাকে সাহায্য করতে শুরু করে। কিন্তু পিতাকে সাহায্য করলে কি হবে, তারা কেউই বাবার মত বুদ্ধিমান ছিল না। সেজন্য বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লোকটির চিন্তা-ভাবনাও বাড়তে লাগল। ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে ভেবে দেখল যে, তার ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, তাতে ছেলেরা সারাজীবন সুখে কাটিয়ে দিতে পারবে। ছেলেরা যাতে ভবিষ্যতে ঝগড়া-ফাসাদ না করে সেজন্য সে ঠিক করল যে, সব সম্পদ বণ্টন করে সে অছিয়তনামা তৈরী করে দিয়ে যাবে। এই ভেবে সে একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষী ডেকে একটি অছিয়তনামা তৈরী করে ফেলল। তার মৃত্যুর পর অছিয়তনামা বের করা হ'ল। তাতে লেখা রয়েছে, ছেলেরা সোনা-চাঁদি, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির সমান অংশ পাবে। তবে সতেরটা হাতির মধ্যে বড় ছেলে পাবে অর্ধেক, মেজো ছেলে পাবে তিন ভাগের এক ভাগ, আর ছোট ছেলে পাবে নয় ভাগের এক ভাগ। এটা ছিল জটিল ব্যাপার। তাই সমাধানের জন্য তারা তিন ভাই শহরের কাযীর কাছে গেল। কাযী বললেন, তোমরা এখন বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। আগামীকাল সকালে আমি নিজে তোমাদের বাড়িতে যাব। তোমাদের হাতীগুলো বাইরে বের করে রেখ। তোমাদের পিতার অছিয়তনামা অনুযায়ী আমি সেগুলো যথাযথভাবে ভাগ করে দেব।

পরের দিন কাযী স্বীয় হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে সেখানে এসে হাযির হ'লেন। তিনি অছিয়তনামা পড়ে সবাইকে শোনালেন। এরপর বললেন, ছেলেরা! তোমাদের বাবা রেখে গেছেন সতেরটি হাতি আর আমি দিলাম একটি। মোট হ'ল আঠারটি। বড় ছেলের অর্ধেক অর্থাৎ সে নয়টি হাতি পাবে। সে তা নিয়ে নিক। মেজো ছেলে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সে পাবে ছয়টি হাতি, সে তা নিয়ে নিক। আর ছোট ছেলে পাবে দু'টো হাতি। কারণ নয় ভাগের এক ভাগ তার পাওনা। এখন নয়, ছয় ও দুই মিলে হ'ল সতেরটা হাতি। এখন বাকী রইল একটি হাতী এবং এ হাতীটি আমার। অতএব আমি আমার হাতীটি ফেরত নিলাম। তোমরা সবাই খুশী হ'লে তো? ছেলেরা তখন যার যার ভাগের হাতী নিয়ে খুশিতে বাগবাগ হ'ল। কাযীর বিচারে সবাই সন্তুষ্ট। এই কঠিন হিসাবের সুষ্ঠু সমাধানে সবাই কাযীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল।

শিক্ষা : উপস্থিত বুদ্ধি বিচারকের অন্যতম গুণ।

৪০. মিথ্যা সাক্ষী

বছরা শহরের এক গৃহস্থের দুই পুত্র ছিল। বড়জনের নাম হাতেম ও ছোটজনের নাম কাযেম। একবার ব্যবসায় তারা কিছু বাড়তি অর্থ লাভ করল এবং বিদেশে সফরে যাওয়ার চিন্তা করল। দিন তারিখ দেখে তারা দু'ভাই এক সাথে বেরিয়ে পড়ল। তিনদিন সফরের পর তারা এক মুসাফিরখানায় আশ্রয় নিল। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করল।

কিছুদূর যেতেই তারা নদীতে একটি পুটুলি ভেসে যেতে দেখে উপরে তুলল। খুলে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। পুটুলিতে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা ও দু'টি হীরকখণ্ড পেয়ে তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল। অতঃপর তা নিজেরা সমানভাবে ভাগ করে নিল। এরপর আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু সঙ্গে এত অর্থ ও মূল্যবান হীরক নিয়ে চলা তারা নিরাপদ মনে করল না। তাই দু'জনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, ছোট ভাই এগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। আর বড় ভাই কিসরা নগরে যাবে। হাতেম বলল, এগুলি নিয়ে তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার ভাবীর হাতে দিবে। ছোট ভাই কাযেম বাড়ি গিয়ে ভাইয়ের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ভাবীর কাছে দিল। কিন্তু হীরকখণ্ড না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। এ সম্পর্কে হাতেমের স্ত্রী কিছুই জানতে পারল না।

এদিকে বড় ভাই হাতেম নানা দেশ ঘুরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা-পয়সা ও মালামাল নিয়ে তিন বছর পর দেশে ফিরে এলো। কয়েকদিন পর সে স্ত্রীকে স্বর্ণমুদ্রা ও হীরকখণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, কাযেম হীরকখণ্ড দেয়নি। তখন হাতেম কাযেমকে জিজ্ঞেস করল, হীরক খণ্ডের খবর কি? তুমি তোমার ভাবীর হাতে ওটা দাওনি। কাযেম কসম করে বলল, ভাই আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলছে। কাযেমের কথা বিশ্বাস করে হাতেম তার স্ত্রীকে তিরস্কার করল। হাতেমের স্ত্রী অপমানিত হয়ে স্বামীকে না জানিয়ে উক্ত শহরের কাযীর কাছে গেল এবং আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে সুবিচার প্রার্থনা করল।

কাযী হাতেম ও কাযেমকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়ে সত্য কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কাযী কাযেমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যখন হীরকখণ্ড হাতেমের স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর কর তখন কোন সাক্ষী ছিল কি? সে বলল, হ্যাঁ, দুইজন সাক্ষী ছিল।

কাযী সাক্ষীদ্বয়কে আদালতে হাযির করার হুকুম দিলেন। কাযেম গিয়ে দু'জন লোককে কিছু অর্থ দিয়ে বলল, ভাই তোমরা আমার সঙ্গে আস। কাযীর দরবারে তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, তিনবছর পূর্বে অমুক দিন তোমাদের উপস্থিতিতে আমি আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে পাঁচশত সোনার মোহর ও একখণ্ড হীরক দিয়েছিলাম। অর্থের বিনিময়ে সে দুই সাক্ষী কাযীর কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল।

কাযী সাক্ষীর পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিলেন যে, হাতেমের স্ত্রীর কাছে হীরকখণ্ড রয়েছে। হাতেমকে হুকুম দিলেন তার স্ত্রীর কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে।

এমতাবস্থায় হাতেমের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে বাদশাহর দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে সুবিচার চাইল। বাদশাহ বললেন, তুমি কাযীর কাছে গেলে না কেন? সে বলল, হুযূর গিয়েছিলাম। কিন্তু সুবিচার পাইনি। এখন আপনার কাছেও সুবিচার না পেলে স্বামীর ঘরে থাকা আমার দায় হয়ে পড়বে।

বাদশাহ হাতেম, কাযেম ও সাক্ষীদ্বয়কে দরবারে ডাকলেন এবং তাদের কাছে সবকিছু বিস্তারিত জানলেন। কাযেম ও তার সাক্ষীরা আগের মতই সাক্ষ্য দিল।

বাদশাহ হাতেম, কাযেম, দু'সাক্ষী ও হাতেমের স্ত্রীকে জেল-হাজতে ঢুকালেন। তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেল বা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর প্রত্যেককে কিছু মোম দিয়ে হুকুম দিলেন, হীরকখণ্ডের আকৃতি তৈরী কর, তাহ'লে ছেড়ে দেওয়া হবে।

হাতেম ও কাযেম দুই ভাই মোম দ্বারা অভিন্ন আকৃতির হীরক তৈরী করল। আর সাক্ষীদ্বয়ের হীরকের আকৃতি হ'ল ভিন্ন ভিন্ন। এদিকে হাতেমের স্ত্রী কিছুই তৈরী করতে পারল না। বাদশাহ সবাইকে দরবারে ডেকে মোম নির্মিত হীরকের আকৃতি উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। দুই ভাই ও সাক্ষীদ্বয়ের তৈরীকৃত হীরক আকৃতি বাদশাহ্র সম্মুখে পেশ করা হ'ল। দরবারের সবাই দেখল যে, দুই ভাইয়ের হীরকের আকৃতি এক ও অভিন্ন। কিন্তু সাক্ষীদের হীরকের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

তখন বাদশাহ ও দরবারের সকলেই বুঝতে পারলেন যে, সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তারা হীরক আদৌ দেখেনি। তাই তাদের তৈরী হীরকের আকৃতিতে মিল নেই। তখন বাদশাহ বললেন, হাতেমের স্ত্রীর তৈরী হীরক আকৃতি কোথায়? হাতেমের স্ত্রী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুযূর! আমি তো হীরক কখনই দেখিনি। আমি কিভাবে হীরক আকৃতি তৈরী করব? তাই আমি কিছুই তৈরী করতে পারিনি। বাদশাহ এবং দরবারে উপস্থিত সকলেই বুঝলেন যে, ছোট ভাই কাযেমই হীরকখণ্ড রেখে দিয়েছে এবং অর্থের বিনিময়ে দু'জন মিথ্যা সাক্ষীও হাযির করেছে।

কাযেম হীরকখণ্ডদ্বয় দরবারে হাযির করল এবং দুই হাতে দুই কান ধরে কসম করল যে, আর কোন দিন মিথ্যা কথা বলব না। আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। বাদশাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

বাদশাহ দু'ভাইকে দু'খণ্ড হীরক দিয়ে বিদায় দিলেন। আর হাতেমের স্ত্রীকে তার সততা ও সাহসের জন্য পুরস্কৃত করলেন। আর সাক্ষীদ্বয়কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর কাযীকে ডেকে বললেন, আপনি সবদিক জেনে-শুনে বুদ্ধি-বিবেচনা করে

বিচার করলেন না কেন? সত্য ঘটনা না জেনেই সেই মহিলার কাছ থেকে হীরকখণ্ড আদায় করতে বললেন। এরূপ রায় দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।

শিক্ষা : সত্য কখনো চাপা থাকে না।

৪১. বাদশাহ আমানুল্লাহ্র বিচক্ষণতা

দুই ভাই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল শহরে দীর্ঘদিন ধরে কসাইগিরি করে প্রচুর টাকা উপার্জনের পর বাড়ী ফিরছিল। পথে এক ফকীরের সাথে তাদের দেখা হ'ল। ফকীর ও তারা এক গাছের নীচে বসে খাবার খেল। ফকীর তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হ'ল। ফকীর বলল, তোমরা এত টাকা উপার্জন করে বাড়ী ফিরছ, টাকাগুলি আমাকে একবার দেখাও'। ফকীর টাকাগুলি নিয়ে তার থলেতে পুরে নিল। দু'ভাই তৎক্ষণাৎ ফকীরের কাছ থেকে টাকাগুলি ছিনিয়ে নিল। ফকীর তখন প্রাণপণে চিৎকার শুরু করে দিল। ফকীরের চিৎকারের বিষয় ছিল, 'আমার টাকা এরা দু'জনে ছিনিয়ে নিয়েছে'।

চিৎকারে বেশকিছু লোক সমবেত হ'ল। ফকীর বর্ণনা দিল, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজধানী শহরে থেকে ভিক্ষা করে টাকাগুলি উপার্জন করেছি। খেতে বসে গল্পে সে কথা প্রকাশ করায় ওরা দু'জনে মিলে আমার টাকাগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে'। অপরদিকে দু'ভাইয়ের কথা তো বানিয়ে বলার দরকার নেই। তারা যা ঘটনা তাই বলল। সমবেত লোকজন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারল না। অগত্যা তারা ফকীর ও দু'ভাইকে বাদশাহ আমানুল্লাহ্র দরবারে হাযির করল।

বাদশাহ উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। তিনি একটা পাতিলে পানি গরম করতে বললেন। পানি গরম হ'লে তিনি টাকাগুলি পানিতে ফেলে দিলেন। পানির স্বাভাবিক রং বদলে গেল। কারণ টাকাগুলিতে কসাইগিরির রক্ত লেগেছিল। বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলে বুঝলেন, টাকাগুলির সত্যিকার মালিক দু'ভাই। টাকাগুলি তাদের দিয়ে দেওয়া হ'ল এবং ফকীরকে শাস্তি দেওয়া হ'ল।

শিক্ষা : অনেক সময় উপস্থিত বুদ্ধি বিচারের কাজে সহায়ক হয়।

৪২. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন

কোন এক দেশে নওশের নামে এক রাজা ছিল। সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, ধন-সম্পদে তার কোন তুলনা ছিল না। অঢেল সম্পদ, বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী এ রাজার মনে বেশ অহংকার ছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ছোট-খাট রাজা-বাদশাহদের সে মানুষ বলে মনেই করত না। তার ছিল এক অপরূপা সুন্দরী মেয়ে। একদিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে রাষ্ট্রীয় কাজে রাজা নওশেরের দরবারে আসে। পথিমধ্যে রাজকুমারীর সাথে মন্ত্রীর ছেলের সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীর ছেলে তার পিতার কাছে রাজা নওশেরের মেয়েকে বিবাহের কথা বলে। মন্ত্রী ছেলেকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, সে বাদশাহর মেয়ে। বাদশাহ নওশের তোমার মতো সাধারণ একজন মন্ত্রীর ছেলের নিকট তার মেয়ে বিয়ে দিবেন না। তাছাড়া সে সোনার চামচ মুখে দিয়ে বড় হয়েছে। আর তুমি একজন মন্ত্রীর ছেলে মাত্র। তার চাহিদা তুমি পূরণ করতে পারবে না। ফলে সংসারে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে। জীবনে কখনো সুখ পাবে না। তুমি এ মেয়ের কথা বাদ দাও। আমি তোমাকে অন্য জায়গায় ভাল ও সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু মন্ত্রীপুত্রের একই কথা- সে রাজকুমারীকেই বিয়ে করবে। অন্যথায় সে আত্মহত্যা করবে।

ছেলের কথা চিন্তা করে মন্ত্রী রাজা নওশেরের নিকটে যান। মন্ত্রী তার পুত্রের সাথে রাজার মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। মন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে রাগে রাজার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। রাজা বলে তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়। সাধারণ একজন উযীর হয়ে আমার মেয়েকে তোমার ছেলের জন্য চাইতে আসলে কোন সাহসে? তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। রাজা মন্ত্রীকে যারপর নাই অপমান করে তার দরবার থেকে বের করে দিলেন।

দেশে ফিরে মন্ত্রী স্বীয় পুত্রকে ঘটনা আদ্যোপান্ত বলে তাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন। এদিকে রাজা নওশেরের অপমান সইতে না পেরে মন্ত্রী হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুতে মন্ত্রীপুত্রও শোকে মুহ্যমান। সে দেশের রাজাও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মন্ত্রীপুত্রের নিকট থেকে মন্ত্রীর মৃত্যুর কারণ শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, বাদশাহ নওশেরের কিসের এত অহংকার, আল্লাহ চাইলে তার রাজত্ব অন্যকে দান করতে পারেন।

এর কিছুদিন পর বাদশাহ নওশের একদা কুরআন তেলাওয়াত করতে বসে সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেন।

'বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমার হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল' *(আলে ইমরান ২৬)*।

এ আয়াত পাঠ করে নওশের ভাবলেন, এটা কি করে সম্ভব? আমার এত সৈন্য-সামন্ত থাকতে কিভাবে আমার রাজ্য অন্যের করতলগত হবে? এটা হ'তে পারে না।

কিছুদিন পর রাজা নওশের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের একটি এলাকা দখল করে নেন। একদিকে মন্ত্রীর মৃত্যু, অন্যদিকে রাজ্যের জমি অন্যায়ভাবে দখল করায় ঐ দেশের বাদশাহ নওফেল নওশেরের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। নওফেল তার বন্ধু রাজা পারভেজের সহযোগিতায় নওশেরের দেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বাদশাহ নওশের পরাজিত হন এবং সপরিবারে বন্দী হয়ে বাদশাহ নওফেলের নিকট নীত হন। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখে এবং মন্ত্রীপুত্রের মনোবাসনা পূরণের জন্য রাজা নওশেরের কন্যার সাথে তার বিবাহ দেন। বিবাহে উপঢৌকন হিসাবে বাদশাহ নওফেল মন্ত্রীপুত্র আনজাসকে নওশেরের রাজ্যের প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আর মন্ত্রীপুত্র আনজাসের শ্বশুর হিসাবে বাদশাহ নওশেরকে মুক্ত করে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা অবস্থানের সুযোগ দেন। রাজা নওফেলের এই মহানুভবতায় বাদশাহ নওশেরও মুগ্ধ হন। তিনি মুক্ত হয়ে আবার একদা কুরআন তেলাওয়াতের সময় সূরা আলে ইমরানের ঐ ২৬ নং আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি এ আয়াত পড়ে কেঁদে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে বাদশাহকে ফকীর ও ফকীরকে বাদশাহ বানাতে পারেন।

শিক্ষা : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তেমনি ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-

সম্মান যাকে ইচ্ছা দান করেন। কিন্তু তা পেয়ে অন্যের প্রতি অত্যাচার, অনাচার করা অনুচিত।

৪৩. সময় মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়

বহুদিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক জমিদার। ধন-ঐশ্বর্য, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তার কোন জুড়ি ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, রামাযানের ছিয়াম পালন, ধন-মালের যাকাত প্রদান সহ ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ তিনি যথাযথভাবে আদায় করতেন। সকাল-সন্ধ্যায় কুরআন তেলাওয়াত ছিল তার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস। একদিন সকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়- وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ 'আর আমি এ দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি' *(আলে ইমরান ১৪০)*। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য মসজিদের ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম ছাহেব অল্পকথায় এভাবে ব্যাখ্যা দিলেন যে, 'কোন কোন সময় ধনী মানুষ নিঃস্ব-দরিদ্র হয়, আবার কখনো দরিদ্র ব্যক্তি বিশাল সম্পদের মালিক হয়'। কিন্তু জমিদার এই ব্যাখ্যা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারলেন না। কারণ বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষ থেকে তাদের জমিদারী বহাল আছে, এরতো কোন পরিবর্তন হয়নি! কোন অবনতি তো দূরের কথা, দিন দিন জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ বেড়েই চলেছে। শত বিঘা জমির উপর বিশাল বাড়ি, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, আস্তাবলে ঘোড়া, সিন্দুক ভরা সোনা-চাঁদির বিশাল মজুদ, আছে হিরা-জহরত সহ মহামূল্যবান রত্ন। কোন আয়-উপার্জন না করে কোন লোক হাযার বছর ধরে বসে খেলেও তা নিঃশেষ হওয়ার নয়। সুতরাং এ সম্পদ কি নিমিষেই শেষ হয়ে একেবারে পথের ভিখেরী হওয়া সম্ভব? না, বিশ্বাস হয় না জমিদারের। প্রকারান্তরে তিনি আয়াতটি কিছুটা অস্বীকার করেন। মনে মনে ভাবেন, এটা কি করে সম্ভব?

ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট আন্তরিক হ'লেও জমিদারের মনে কিছুটা অহংকার ছিল। কিছুটা বদ মেজাযীও ছিলেন তিনি। আবার কাজে-কর্মে ছিলেন একরোখা ও ভীষণ জেদি। যা করতে চাইতেন তা করে ফেলতেন। এজন্য

তার কর্মচারী-কর্মকর্তারা যেমন তাকে যারপরনাই ভয় করত, তেমনি পরিবারের সদস্যরাও তার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। কারো কথায় বা পরামর্শে তিনি চলতেন না, নিজে যা বুঝতেন তাই করতেন। অনেকটা স্বৈরাচারী স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি। লঘুদণ্ডে কাউকে গুরু শাস্তি প্রদান, আবার মহা অপরাধেও কাউকে ক্ষমা করে দিতেন সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল-খুশিমত। ফলে তার দ্বারা অনেক সময় নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষও নির্যাতনের শিকার হ'ত।

একদা তার এক ছেলে তীর-ধনুক নিয়ে খেলছিল। এক দরিদ্র বৃদ্ধার একটি ছাগলের গায়ে তার নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে ছাগলটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বৃদ্ধা বিচারপ্রার্থী হয়ে জমিদারের দরবারে আসে। জমিদার ছেলেকে ডেকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। ছেলে উল্টো অভিযোগ করে যে, খোলা মাঠে এভাবে ছাগল না থাকলে তো মরতো না। জমিদার ছেলের কথায় সায় দিয়ে বৃদ্ধার ছাগলের মূল্য না দিয়ে খোলা মাঠে ছাগল ছেড়ে দেয়ার অপরাধে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। বৃদ্ধা আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করে, আল্লাহ! তুমি এর বিচার করো!

একবার জমিদারের নায়েবের ছেলে ও জমিদারের ছেলের মধ্যে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় নায়েবের ছেলে বিজয়ী হয়। পক্ষান্তরে জমিদারের ছেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। সুস্থ হয়ে সে নায়েবের ছেলেকে বেদম প্রহার করে এবং তার ঘোড়াটাকেও মেরে ফেলে। নায়েব জমিদারের কাছে বিচার দিলে তিনি তার কোন বিচার না করে উল্টো নায়েবকে বলেন, আমার ছেলের বিরুদ্ধে আমার কাছে বিচার দিতে তোমার একটুও বাঁধল না। আমার খেয়ে, আমার পরে আমার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ? একটু মেরেছে তো কি হয়েছে? মরেতো যায়নি! চিকিৎসা করাও ভাল হয়ে যাবে। নায়েব একবুক ব্যথা নিয়ে অতিকষ্টে বাড়ি ফিরে আসে। আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদে কেটে দো‘আ করে, আল্লাহ! তুমিই ন্যায়বিচারক। এই যুলুমের সুষ্ঠু বিচার তোমার কাছে প্রত্যাশা করছি। তুমি এর বিচার করো!

জমিদারের ছিল শিকারের প্রবল নেশা। তিনি একদিন ঘটা করে তার লোকজন নিয়ে গভীর অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে যান। ৪/৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও তেমন কোন শিকারের সন্ধান না পেয়ে বনের আরো গভীরে

চলে যান। পথিমধ্যে শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। জমিদার তার লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। এক একজন একেক দিকে ছুটে যায় প্রাণ বাঁচাতে। ফলে কারো সাথে কারো কোন যোগাযোগ থাকে না। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জমিদারও দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য রাজার দেশে চলে যান। ঘটনাক্রমে ঐদিন রাজার বাড়িতে ডাকাতি হয়। খোয়া যায় অনেক মূল্যবান জিনিস।

এদিকে রাজ্যের পাইক-পেয়াদা, সৈন্য-সামন্ত ডাকাত দলের খোঁজে প্রতিটি এলাকা ও বন-বাদাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে তারা ঐ জমিদারকে বনের এক পাশে পেয়ে তাকেই ধরে নিয়ে যায়। গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ দামী হ'লেও তাতে ময়লা-আবর্জনা লেগে আছে। উষ্কখুষ্ক চুল, বিবর্ণ চেহারা। মুখে আভিজাত্যের ছাপ থাকলেও অন্ধকারে তা কেউ খেয়াল করেনি। তাকেই ডাকাত মনে করে ধরে নিয়ে যায়। ফেলে রাখে কয়েদখানায়। পরদিন সকালে রাজা ডাকাত বলে ধৃত জমিদারকে দেখতে আসেন। তাকে দেখে রাজার মনে ধাক্কা লাগে- এতো ডাকাত হ'তে পারে না? ঘুমিয়ে ছিল বলে তাকে রাজা ডাকতে নিষেধ করেন। ঘুম ভাঙ্গলে জমিদার ওযূর পানি চান। তিনি ওযূ করে ছালাত আদায় করে ভাবতে থাকেন- আমি এখানে কেন? তিনি আস্তে আস্তে মনে করতে থাকেন। শুধু তাঁর মনে পড়ে যে, তিনি শিকারে বের হয়েছিলেন এবং ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জমিদার রক্ষীদের প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, তাকে ডাকাত হিসাবে ধরে আনা হয়েছে। তিনি তখন রাজার সাথে দেখা করতে চান। রাজার দরবারে তাকে আনা হ'লে তিনি ঘটনা খুলে বললেন। আর রক্ষীর কাছে তার ছালাত আদায়ের কথা শুনে রাজা ভাবলেন এ লোক ডাকাত হ'তে পারে না। রাজা তাকে ছেড়ে দেন। এদিকে জমিদার বাড়ি এসে দেখে তার বাড়ির অধিকাংশ নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে, বাসভবন ধসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আর কেউ বেঁচে নেই। ধন-ভাণ্ডারও নদীগর্ভে বিলীন। নায়েব, পাইক, পেয়াদা কে কোথায় আছে কারো হদিস নেই। জমিদার মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিজের অতীত-বর্তমানের কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ে কুরআনের ঐ আয়াতের কথা। জমিদার কেঁদে কেটে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করেন। নিজের ভুলের জন্য, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান।

শিক্ষা : ক্ষমতার মোহে অনেক সময় মানুষ স্ফীত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সে মনে করে, তার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কখনোই নষ্ট হবে না। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৪৪. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

এক গ্রামে ত্বাইয়েব ও তাহের নামে দুই বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। যাকে বলে গলায় গলায় ভাব। এদের মধ্যে ত্বাইয়েব এলাকায় ভাল ছেলে হিসাবে পরিচিত ছিল। লেখা-পড়া, চাল-চলন, আচার-আচরণে আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে তাহের ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। দুষ্টুমিতে তার কোন জুড়ি ছিল না। গ্রামে কারো গাছের পেয়ারা, কারো পেঁপে, কারো তাল, কারো নারিকেল চুরি করে খাওয়াই ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। কাউকে গালি দেওয়া, কাউকে অযথা চড়-থাপ্পড় মারা ছিল তার মজ্জাগত দোষ। গ্রামের প্রভাবশালী মোড়লের ছেলে বলে তার গায়ে কেউ হাত তোলার সাহস পেত না। কিন্তু গ্রামবাসী তাকে কখনো ভাল চোখে দেখত না। কোন লোক তার ছেলে বা ভাই-ভাতিজাকে তাহেরের সঙ্গে মিশতে দিত না।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে ত্বাইয়েব দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ত্বাইয়েবের এ বিপদ মুহূর্তে তাহের এগিয়ে আসে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, তাদের বাড়িতে খবর দেয়। এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ত্বাইয়েব তাহেরের বাড়িতে যায়। এ থেকে দু'জন দু'জনের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে। ফলে তাদের মধ্যে সখ্যতা আরো বাড়ে। কালক্রমে তাহেরের দুষ্ট চরিত্রের অসৎ গুণাবলী ত্বাইয়েবের মাঝে সঞ্চারিত হয়। সেও লিপ্ত হয় নানা গর্হিত কাজে। ফলে তার লেখাপড়ায় দুর্বলতা চলে আসে। বন্ধুরা তার ধারে কাছে ঘেঁষে না, শিক্ষকরাও তাকে আর ভাল চোখে দেখেন না। গ্রামের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, দুষ্ট তাহেরের খপ্পরে পড়ে সোনার টুকরা ত্বাইয়েব ছেলেটাও দিন দিন গোল্লায় যেতে বসেছে।

একদিন ত্বাইয়েবের কানেও এসব কথা চলে আসে। তখন সে ভাবতে থাকে, তার এই অধঃপতনের মূল কারণ কি? সে চিন্তা করতে থাকে এক সময় আমি

ক্লাসে প্রথম হ'তাম, এখন আমার রোল নম্বর দশের নীচে। এক সময় ক্লাসের ছেলেরা আমার পিছে পিছে ঘুরত অংক, ইংরেজী বুঝে নেওয়ার জন্য। অথচ আজ আমি সবার চোখে খারাপ হয়ে গেছি। অন্তরঙ্গ বন্ধু আব্দুল্লাহও আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। লেখাপড়ায় সে ব্যাপক উন্নতি ও ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। চরিত্র-মাধুর্যেও সে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজ সে গ্রামের ভাল ছেলে বলে পরিচিত। এর মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে সে রহস্য উদঘাটন করে যে, স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুর রহমান স্যারের সাথে আব্দুল্লাহ্র সম্পর্ক। তাঁর কথামত সে চলে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। নিয়মিত পড়াশুনা করে। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে না। পড়ালেখার ফাঁকে অবসর সময়ে ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে এবং কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করেই তার সময় কাটে। তাই তার এত সুনাম, লোকের মুখে মুখে তার প্রশংসা। ত্বাইয়েব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, তাকেও আব্দুল্লাহ্র মত হ'তে হবে। ত্বাইয়েব তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের নিকট গিয়ে বলল, স্যার! আমি খারাপ হয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ার। এ থেকে উত্তরণের উপায় কি? কিভাবে আমি ভাল হ'তে পারি স্যার? মাওলানা আব্দুর রহমান বললেন, তুমি আগে এরূপ ছিলে না। সঙ্গদোষে তোমার এ অবস্থা? তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাব,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَـــلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّـــا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً-

আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মিশকে আম্বরওয়ালা ও হাপরওয়ালার ন্যায়। মিশকে আম্বরওয়ালা তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু সুগন্ধি ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি সুগন্ধি লাভ

করবে। আর হাপরওয়ালা তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দেবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে' *(বুখারী হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০)*।

এ হাদীছ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হ'ল, চরিত্রবান, সৎ ও ভদ্র দেখে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি তোমাকে নিয়মিত ছালাত আদায়, অবসরে কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন এবং প্রতিদিন নিয়মিত ৫/৬ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে হবে। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ পরিহার করে চলতে হবে। আড্ডা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এসব যদি মেনে চলতে পার, তাহ'লে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তুমি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হ'তে পারবে।

অতঃপর ত্বাইয়েব তার শিক্ষকের পরামর্শমত চলতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে লেখাপড়ায় তার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিনা প্রয়োজনে সে বাড়ির বাইরে যায় না। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে না। অবসরে সাহিত্যচর্চা করে, ধর্মীয় বই পড়ে। এভাবে চলতে চলতে অল্পদিনের মধ্যেই ত্বাইয়েব সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়। সবাই তাকে দেখলে পূর্বের মত আদর করে। বাবা-মা তাকে নিয়ে গর্ব করেন। সামনে তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। শিক্ষক-অভিভাবক সবার প্রত্যাশা ত্বাইয়েব এবার আরো ভাল করবে।

শিক্ষা : সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। অসৎসঙ্গ সর্বদা পরিহার করতে হবে। ছেলে-মেয়ের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে অভিভাবকদেরও সতর্ক থাকতে হবে। কোনক্রমেই যাতে চরিত্রহীনদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব না হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে।

৪৫. ষড়যন্ত্রের পরিণতি

যে সময় সারা দুনিয়া অগণিত ছোট-বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজা-বাদশাহ দ্বারা দেশ শাসিত হ'ত, সে সময়ের একটি কাহিনী। এক রাজা একদিন অত্যন্ত চিন্তিত মনে রাজদরবারে বসে আছেন। এ সময় উযীর তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, রাজা চিন্তায় বিভোর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মনে হয় কোন বিষয়ে চিন্তা করছেন? রাজা বললেন, আপনার অনুমান সঠিক। আমার বিবাহিত জীবনের বার বছর কেটে গেল, অথচ আমার কোন সন্তান হ'ল না। এত বড় একটি রাজ্য, এর উত্তরাধিকার নেই। আমার

অনুপস্থিতিতে রাজ্যটির অবস্থা কী হবে? এ চিন্তায় আমি মুষড়ে পড়েছি। আমার স্ত্রী সম্ভবত আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। আমি আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসি। তাই আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতেও অনিচ্ছুক।

উযীর বললেন, আপনার এত বড় রাজ্য একজন উত্তরাধিকারের অভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে- এটা তো হ'তে দেওয়া যায় না। তাই আমি আপনাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অনুরোধ করছি এবং এটা রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনকও বটে। অনুমতি পেলে আমি আপনার জন্য অতিসত্বর একজন উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করতে পারি।

রাজা বললেন, পাত্রী আমার নির্বাচন করাই আছে। তবে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছি। কেননা এতে আমার প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সম্ভবত স্ত্রীরও সম্মতি পাব না। কেননা নারীরা সতিন চায় না। তারা স্বামীকে একান্ত আপন করে নিতে চায়। আর আমার নির্বাচিত পাত্রীটি হচ্ছে আপনারই মেয়ে।

রাজার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় একদিন অচেনা এক ফকীর এসে রাণীর নিকট খাবার চাইল। ফকীরের সারা দেহ ঘায়ে ভরা, সে ঘা হ'তে দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে। রাণী তাকে পেট পুরে খাওয়ালেন। ফকীর খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দো'আ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি রাণীমাকে অতি সত্বর একটি পুত্রসন্তান দান কর'। দো'আ করার কিছুক্ষণ পরেই ফকীরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আল্লাহ পাক ফকীরের দো'আ কবুল করেছেন। রাণীমা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন।

উযীরের যুক্তি ও পরামর্শে রাজা বিয়ে করতে স্থির সংকল্প করেছেন। বিয়ের দিন-তারিখও ধার্য হয়েছে। বিয়ের কথা জানতে পেরে রাণীমা রাজাকে বললেন, আপনি এ বিয়ে বাতিল করুন। আল্লাহ পাকের অশেষ দয়াতে আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। অন্ততঃ কিছুদিন ছবর করুন! উযীর রাণীর কথা শুনে বললেন আর ভাবলেন, বিয়ে বানচাল করতে রাণীমার এটি একটি কৌশল মাত্র। কারণ বারো বছর যার সন্তান হয়নি, দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে তার গর্ভে সন্তান কিভাবে আসতে পারে? উযীরের নিজ কন্যার সাথে রাজার বিয়ে হবে, এতে তিনি গড়িমসি করতে পারেন না। তাই তিনি রাণীর কথায় কান না দিতে রাজাকে বিয়েতে প্ররোচিত করলেন।

রাজার দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেল। দ্বিতীয় স্ত্রীই এখন রাজার হৃদয়মন জয় করে ফেলেছে। তার যে কোন কথাই এখন রাজার শিরোধার্য। সে যখন বুঝতে পারল, রাণী সত্যি সত্যিই সন্তানসম্ভবা, তখন সে এক চাল চালল। সে সঠিকভাবে বুঝেছিল যে, রাণীর সন্তান হ'লে রাজার সমুদয় ভালবাসা তার প্রতি নিবেদিত হবে। তাই সে রাণী সম্বন্ধে রাজার নিকট অপবাদ দিল। বলল, যেদিন আপনি শিকার করতে গেছেন, ঐদিন আমি তাকে সেনাপতির সাথে গোপনে কথা বলতে দেখেছি। একথা শুনামাত্র রাজা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে তলব করতে চাইলেন। উযীর কন্যা বলল, আপনি একাজ না করে রাণীকে নির্বাসনে পাঠান। সেনাপতিকে ক্ষেপিয়ে কাজ নেই। রাজা বুঝলেন যে, উযীর কন্যার কথা উযীরের মতই। তাই তিনি তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

রাজা এক রক্ষীকে দিয়ে রাণীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। দুই রাজ্যের সীমানা দিয়ে এক নদী প্রবাহিত। রক্ষী তাকে নদী তীরের এক বনভূমিতে রেখে ফিরছে। রাণী রাজাকে তার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ দিতে রক্ষীকে অনুরোধ জানান। রক্ষী রাণীকে বনবাস দেওয়ায় রাণীর নিকট ক্ষমা চাইল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একাজ করতে হয়েছে। আমরা হুকুমের দাস। হুকুম অমান্য করলে আমাদের গর্দান যাবে। রক্ষী রাজাকে সংবাদ দেবার অঙ্গীকার করল।

রাণী নির্বাসিত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লাহ্র নিকট আবেদন-নিবেদন করছিলেন। এমন সময় নদী পথে এক সওদাগর যাচ্ছিলেন। নারীর কান্না শুনে তিনি নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামলেন। দেখলেন, এক পরমা সুন্দরী নারী ক্রন্দন করছে। তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাণী সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। রাণী বললেন, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন ভাই! আমাকে আশ্রয় দিলে আল্লাহ আপনার প্রতি খুশী হবেন। আমি একজন গর্ভবতী নারী।

সওদাগর লোকটি একটু বয়সী ছিলেন। তাঁর কোন বোন ছিল না। রাণীর ভাই ডাকে তিনি খুশী হ'লেন। তিনি রাণীকে উপযুক্ত আশ্রয় দিলেন। যথাসময়ে রাণী একটি সুদর্শন পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। সে ঐ আশ্রয়ে থেকেই বড় হ'তে লাগল।

Contents

এদিকে রক্ষী রাজাকে রাণীর সন্তানসম্ভবা হওয়ার সংবাদ দিলেন এবং কোন সূত্রে দ্বিতীয় রাণীর চক্রান্তও রাজার নিকট প্রকাশিত হ'ল। রাজা এর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত হ'লেন। সেনাপতি পালিয়ে যেতে উদ্যত হল। দ্বিতীয় রাণী তাকে বলল, তুমি নাকি সেনাপতি? তুমি একজন কাপুরুষ! একা তুমিই এ রাজ্যের সর্বেসর্বা হ'তে পার, প্রয়োজন কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা। প্রথমতঃ তুমি তোমার সৈন্যদেরকে হাত কর। এরপর প্রজাদেরকে অধিকহারে খাজনা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোল। তারপর রাজাকে বন্দী করে প্রজাদের জানিয়ে দাও, রাজার ঘোষণা অনুযায়ী খাজনা দিতে হবে না। এখন থেকে অর্ধেক খাজনা গ্রহণ করা হবে।

যে পুরুষ বা নারী অন্যের নামে অপবাদ দেয়, সে নারী বা পুরুষ চরিত্রবান হয় না। এ নারীও তাই। রাজাকে বাদ দিয়ে তার মনোরাজ্যে এখন সেনাপতিই আসন গেড়েছে। উযীর কন্যার পরামর্শ মোতাবেকই সেনাপতি কাজ করে চলেছে। রাজাকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে যে রক্ষী রাণীকে নির্বাসনে দিয়ে এসেছিল, সে-ই রাতের অন্ধকারে রাজাকে বন্দীশালা হ'তে উদ্ধার করে যেখানে রাণীকে নির্বাসন দিয়ে এসেছিল সেখানে রেখে এল।

ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয়, তখন বিপদ আপনাআপনি কেটে যায়। তাই রাজা ঘুরতে ঘুরতে রাণীর আশ্রিত স্থানে এসে পৌঁছলেন। রাজা-রাণীর সাক্ষাৎ হ'ল। উভয়ে তখন পুনর্মিলন আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাণী ছেলেকে পিতার সাথে পরিচয় করে দিলেন। রাজা ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন।

রাজা লোক মারফত গোপনে নিজ রাজ্যের লোকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখলেন। এ রাজ্যের রাজার সহায়তায় অতি সহজেই রাজা নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন। কারণ তিন ব্যক্তি ছাড়া সবাই রাজার প্রতি আনুগত্যশীল ছিল। সেনাপতি, উযীর ও উযীর কন্যা। অবশেষে তারা ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল।

শিক্ষা : যে অন্যের জন্য ষড়যন্ত্র করে সে নিজেই সেই ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি সর্বদা এমনই হয়ে থাকে। আরবী প্রবাদে আছে, مَنْ حَفَرَ بِئْراً لِأَخِيْهِ؛ وَقَعَ فِيْهِ 'যে তার ভাইয়ের জন্য কূপ খনন করে, সে নিজেই তাতে পতিত হয়'।

৪৬. বক ও কাঁকড়া

একটি বক কোনো এক জলাশয়ের ধারে বাস করতো আর জলাশয়ের মাছ খেয়ে দিন কাটাতো। বৃদ্ধ বয়সে যখন তার মাছ শিকারের শক্তি থাকল না, তখন মনে মনে ভাবল, এবার কৌশলে মাছ শিকার করতে হবে। একদিন খুব বুকভরা দরদ নিয়ে জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসল। তার মুখ দেখে এক কাঁকড়ার দয়ার উদ্রেক হ'ল। সে জিজ্ঞেস করল, কি ভাই তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?

বক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কী বলব ভাই, আজ দু'জন শিকারীকে আলাপ-আলোচনা করতে দেখলাম। তাদের একজন বলল, জলাশয়টিতে অনেক মাছ আছে, চলো আমরা জাল দিয়ে মাছগুলো ধরে নিয়ে যাই। অন্যজন বলল, না। তার আগে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে; পরে সুযোগ মতো ধীরে ধীরে নিলেই চলবে। এসব কথা শুনে আমি খুব ব্যথিত হয়েছি। যদি সব মাছ ধরে নিয়ে যায়, তাহলে আমার কি উপায় হবে? এদের উপরই আমার জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। এতদিন এখানে থাকতাম, এখন বাকি জীবনে বুড়া বয়সে কোথায় যাব। কাঁকড়া এ কথা শুনে সব মাছকে খবর দিল। ওরা শুনে হায়! হায়! করতে শুরু করল এবং বকের নিকট এসে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় জানতে চাইল। বক বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, কাছেই খুব বড় একটি নদী আছে। আমি তোমাদেরকে এতটুকু সাহায্য করতে পারি যে, প্রতিদিন কিছু কিছু মাছকে সেখানে পৌঁছে দিব। মাছেরা পরামর্শ শুনে খুব খুশি হল। এমনি করে বক কৌশলে মাছ ধরে খেতে আরম্ভ করল। এভাবে কিছুদিন খাওয়ার পর কাঁকড়ার একদিন সে নদী দেখার সাধ জাগল। বকের পিঠে চড়ে সে নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দূর থেকে মাছের হাড়ের স্তূপ দেখেই সে বকের কৌশল বুঝতে পারল। তখন তার মনে পড়ল- জ্ঞানীরা বলেছেন, শত্রু যখন তোমার অধীনে থাকে তখনি তাকে শেষ করে দাও। তাতে যদি সফল হও ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার নাম থাকবে, আর মারা গেলেও বেইয্যতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। কাঁকড়া বুদ্ধি করে বকের গলা চেপে ধরল। বৃদ্ধ বক কিছুক্ষণ ছটফট করে মারা গেল।

শিক্ষা : যে অন্যের জন্য কূপ খনন করে, সেই তাতে নিপতিত হয়।

৪৭. বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ও ঐক্যের শক্তি

অনেকদিন আগের কথা। গভীর বনে বাস করত এক শিয়াল এবং তার পাশে বাস করত এক গরু। গরু সহ অন্যান্য প্রাণীর জীবনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তারা প্রতিনিয়ত বনের হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ত। তাই শিয়াল ও গরু মিলে চিন্তা করল বনের নিরীহ প্রাণীদের নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা করা দরকার। তারা দু'জন একমত হ'ল যে, বনের সকল নিরীহ প্রাণীদের নিয়ে একটি সমাজ গঠন করা হবে। তাদের এই সিদ্ধান্তে বনের নিরীহ প্রাণীরা খুশীতে বাগবাগ হয়ে উঠল এবং তারা বনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এই সমাজের আওতাভুক্ত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল। বনের নিরীহ প্রাণীদের নিয়ে গঠিত এই সমাজকে গরু ও শিয়াল মিলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পারস্পরিক সহমর্মিতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। এভাবে তারা হিংস্র প্রাণীদের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার পথ সুগম করল।

এভাবে চলতে চলতে একদিন শিয়াল ও গরু দুই বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে নিজেদের সীমানা অতিক্রম করে গভীর বনে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হয় বিশালদেহী ভয়ংকর এক সিংহ। তার চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিংগ ছিটকে পড়ছে এবং রাগের প্রচণ্ডতায় সে থরথর করে কাঁপছে। কেননা তাদের দু'জনের কারণেই তার শিকার আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। সাথে সাথে বনে তার আধিপত্যও আগের চেয়ে কমে গেছে।

সিংহের এই রাগ দেখে শিয়াল ভড়কে যায় এবং সে মাথায় কুটিল বুদ্ধি আঁটে। সে গরুকে বলল, বন্ধু! তুমি এখানে থাক। আমি সিংহকে গিয়ে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে নিয়ন্ত্রণ করছি। এই বলে সে সিংহের কাছে গিয়ে বলল, মামা! আমি চিরজীবন তোমার সাথেই ছিলাম, এখনো তোমার সাথেই আছি। এইতো দেখছ বনের নিরীহ প্রাণীদের নব জাগরণের অগ্রদূত তোমার চির শত্রু শয়তান গরুটাকে তোমার জন্যই এনেছি। তুমি ওকে খেয়ে তোমার কলিজা ঠাণ্ডা কর।

জবাবে সিংহ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আগে গরুটাকে বনের পাশের একটা গোপন গর্তে নিয়ে যাও। কেননা গরুকে প্রকাশ্যে খেলে তার অনুগত

জন্তুদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। শিয়াল হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে গরুর কাছে এসে তাকে বলল, সিংহ আমাদের পাশের গর্তে যেতে বলল, তাহ'লে আমরা রক্ষা পাব। গরু শিয়ালের কথা সরল মনে বিশ্বাস করে পাশের গর্তে চলে গেল। এদিকে শিয়াল এসে সিংহকে বলল, সে যেতে চাইছিল না। অনেক বুঝিয়ে ওকে নিয়ে গেছি। যান এবার আপনার দিলটা জুড়িয়ে আসেন। সিংহ সে কথার দিকে কর্ণপাত না করে শিয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিয়াল চিৎকার করে বলল, হুযূর আমাকে কেন? আপনার জন্যে তো গরুকে গর্তে রেখে এসেছি। দয়া করে আমাকে খাবেন না। জবাবে সিংহ বলল, 'ওরে দুষ্ট শিয়াল তুই যদি তোর চিরদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিপদ-আপদ ও তোদের সমাজ গঠনের অন্যতম সাথী গরুর সাথে শুধুমাত্র তোর নিজ স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিস, তাহ'লে তুই যে পরে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবি না- এর কি নিশ্চয়তা আছে?

ওরে মুনাফিক! এজন্য আগে তোকেই খাব। আর গরু তো গর্তে ধরাই আছে, ওকে পরে খেয়ে নেব। এই বলে সে শিয়ালের ঘাড় মটকাল। অন্যদিকে বনের প্রাণীরা এই অবস্থা জেনে ফেলে এবং তারা সবাই গর্তে আটকা পড়া তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার কাছে সমবেত হয়ে ঘটনা কি তা জানতে চায়। গরু শিয়ালের বিশ্বাসঘাতকতা সহ তার বিপদের ঘটনা পুরো খুলে বলে। বনের প্রাণীরা ঘটনা শুনে শিয়ালের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার করুণ পরিণতিতে আনন্দ প্রকাশ করে।

এদিকে সিংহ শিয়ালকে শেষ করে গরুকে খাওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। বনের প্রাণীরা তার এই আগমনের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত সুসংঘবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় গরুকে ঘিরে এক নযীরবিহীন নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টি করে এবং সকলেই একসাথে নিজ নিজ কণ্ঠে ভীষণ আওয়াযে হুংকার দিতে থাকে। তাদের এই সমবেত হুংকার বনের চারিদিকে এক রণতরঙ্গ সৃষ্টি করে। তাদের এই রণতরঙ্গে হিংস্র সিংহের হুংকার দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

সিংহ তাদের এই অবিচ্ছেদ্য অটুট ঐক্য ও হুংকারে ভড়কে যায়। গরুকে খাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে সে পিছুটান দেয় এবং পালিয়ে বনের ভিতর চলে যায়।

অন্যদিকে নিরীহ হাযার হাযার প্রাণীর সমবেত উচ্চারণ বনের দিগ-দিগন্তে পৌঁছে যায় এবং সবাই তাদের একতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার কথা জানতে পারে। ফলে হিংস্র প্রাণীরা ছাড়া সমস্ত বনে আরো যত প্রাণী ছিল সবাই গরুর নেতৃত্বে সমবেত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একই সমাজভুক্ত হয়। এইভাবে পুরো বন নিরীহ প্রাণীদের আওতাধীন হয় এবং সমস্ত বনের নেতা হয় গরু।

শিক্ষা : যুগে যুগে স্বজাতির সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের পরিণতি হয়েছে ঠিক ঐ শিয়ালের মতোই। পক্ষান্তরে ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোন শক্তিই হার মানতে বাধ্য।

৪৮. কূটকৌশলের পরিণাম

একজনের অধিকারে অন্যজনের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলেই জগতে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। জগতের অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ এ অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ অশান্তি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তবুও এ অশান্তির শিকার হয় অগণিত মানুষ। এ সম্পর্কে নিম্নের কাহিনী-

অনেক দিন আগের কথা। পাশাপাশি দু'টি মুসলিম রাজ্য। রাজ্য দু'টির মধ্যে সখ্যতা বিদ্যমান। এক রাজ্যের বড় শাহজাদার নাম হারূণ। ছোট শাহজাদা ইমরান। সে বাদশাহর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। বড় শাহজাদা হারূণ বাদশাহর মত সৎ এবং রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণে উপযুক্ত। বাদশাহর ইচ্ছা, তিনি বড় শাহজাদার উপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে বাকী জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছার চরম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর বেগম। বেগমের ছেলে ইমরানও বেশ বড় হয়েছে। বেগমের ইচ্ছা, ইমরানই সিংহাসনের অধিকার লাভ করুক। কিন্তু বেগম জানেন, বাদশাহর কাছে তাঁর ছেলেকে রাজ্যভার অর্পণের কথা জানালে তাতে বাদশাহর সম্মতি পাওয়া যাবে না। তাই এ ব্যাপারে তিনি কিছু কূটকৌশলের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাঁর রাজ্যে কোথাও কোন গোলমাল-গোলযোগ নেই। রাজ্যের সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। এমন দিনে এক প্রজা বাদশাহর দরবারে এসে অভিযোগ দায়ের করল যে, কে একজন তার কন্যাকে অপহরণ করেছে। সে এর উপযুক্ত বিচার চায়। বাদশাহ অভিযোগ শুনে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এত বড় অনাচার কার দ্বারা সাধিত হ'ল? অতি সত্বর তদন্ত করে আসামীকে রাজ দরবারে উপস্থিত করার জন্য বাদশাহ প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন। তদন্তে পাওয়া গেল, বাদশাহর দ্বিতীয় ছেলে ইমরানই এ অপকর্ম করেছে। বাদশাহর কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই বিষয়টি বেগম জানলেন। তিনি ছেলেকে এ কাজের জন্য খুব তিরস্কার করলেন। কেননা বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তাই তিনি অন্দর মহলের ঝি দ্বারা প্রধান সেনাপতিকে গোপনে ডাকলেন। তিনি সেনাপতিকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বশীভূত করে ফেললেন। বিষয়টি যাতে কোনক্রমেই ফাঁস না হয় সেজন্য তাকে বিশেষভাবে বললেন। এমনকি বাদশাহও যাতে এটা জানতে না পারে তার ব্যবস্থাও করতে বললেন। উপঢৌকন গ্রহণ করে সেনাপতি বাদশাহকে জানালেন, তদন্তেকাউকে দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। অভিযোগটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। কাউকে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল না।

শিকারে বের হওয়া রাজা-বাদশাহদের প্রিয় শখ। এতে নাকি তাঁদের মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। বড় ছেলেকে কোন অজ্ঞাত কারণে একটু বিমর্ষ বলে মনে হ'ল বাদশাহর। তাই তিনি তাকে শিকারে যেতে আদেশ করলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজকন্যা জাহানারাও সঙ্গী-সাথী সহ একই বনে শিকারে উপস্থিত। একটি পাখীকে উভয়েই তীর নিক্ষেপ করল। দু'টি তীরই পাখীর দেহে বিদ্ধ হয়ে পাখীটি মাটিতে পড়ে গেল। শাহজাদা বলল, আপনার তীরের আঘাতে পাখীটি ধরাশায়ী হয়েছে। অতএব পাখীটি আপনার। রাজকন্যাও অনুরূপ বলল। উভয়ের মধ্যে পরিচয়-পরিচিতি হ'ল। শাহজাদা মনে মনে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এসে পিতাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। আগে থেকে পার্শ্ববর্তী ঐ রাজ্যের সাথে সখ্যতা ছিল। বাদশাহ তাই সানন্দে শাহজাদার প্রস্তাবে রাযী হয়ে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পাদন করে দিলেন।

এখন বাদশাহর একটি কাজ বাকী। তা হ'ল শাহজাদাকে রাজ্যভার অর্পণ করা। বাদশাহ এজন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। বেগম দেখলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে আর দেরি করা চলে না। তাই তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, শাহজাদাকে কিছু পান করিয়ে সাময়িক উন্মাদ করে দিবেন। এজন্য তিনি শরবত তৈরী করে ঝি দ্বারা বড় শাহজাদাকে ডাকলেন। শাহজাদা সৎমাকে আপন মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। মায়ের ডাক পেয়ে ছেলে এলে মা বললেন, তোমার জন্য আমি এ শরবত তৈরী করে রেখেছি, পান কর। বেগমের বাহ্যিক আচরণে কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি অন্তরে শাহজাদার প্রতি চরম বৈরিতা পোষণ করেন। শাহজাদা কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ে না পড়ে সরল মনে শরবত পান করল। সাথে সাথে তার পাগলামি শুরু হয়ে গেল। বেগম বাদশাহকে তাঁর কক্ষে ডাকলেন। স্বচক্ষে তার এরূপ আচরণ লক্ষ্য করে তার প্রতি তাঁর ধারণা পাল্টে গেল। তিনি ছেলেকে রাজবাড়ী হ'তে বের করে বনবাসে পাঠালেন। শাহজাদার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যেয়ে এক লোকের আশ্রয়ে উঠল।

এরপর বেগম গোপনে প্রধান সেনাপতিকে ডাকলেন। তিনি সেনাপতিকে আগে থেকে আরো বেশী পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে বাদশাহকে বন্দী করে কারাগারে পাঠাতে বললেন। সেনাপতি বাদশাহকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। বেগম এবার তাঁর ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন। ইমরান এখন বাদশাহ, রাজ্যের সর্বেসর্বা। বাদশাহ হয়েই সে নিত্য নতুন আইন জারী করে প্রজাদের উপর নির্যাতন শুরু করে দিল। বেগম এতে বাধা দিলেন। কিন্তু সে তার মায়ের কথায় কান দিল না। প্রজারা ক্ষিপ্ত হ'তে লাগল।

নতুন বাদশাহ তার মায়ের মতই ধূর্ত। সে জানে, এবার সেনাপতি প্রতিশ্রুত উপঢৌকন দাবী করবে। তাই সে সেনাপতিকে পুরস্কার প্রদানের জন্য ডাকল। সেনাপতি আসলে তরবারী উঁচিয়ে বলল, পুরস্কারের লোভে যে ব্যক্তি একজন সৎ বাদশাহকে কারাগারে পাঠাতে পারে, পুরস্কারের লোভে সে আমারও চরম ক্ষতি করতে পারে। এ বলেই তাকে শেষ করে দিল।

বাদশাহর বিয়াই বাদশাহ সমস্ত সংবাদ অবগত হওয়ার পর প্রথমে জামাই ও মেয়েকে নিজ প্রাসাদে আনলেন। এরপর তিনি জামাই সহ সামরিক অভিযান

পরিচালনা করে বন্দী দশা হ'তে বাদশাহকে উদ্ধার করলেন। নতুন বাদশাহ ও বেগমকে বন্দী করা হল। বেগম বুঝলেন, এখন তাদের মৃত্যু অবধারিত। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, সব অপকর্মের জন্য আমিই দায়ী। আমাকে মেরে ফেলুন। আমার ছেলেকে মুক্তি দিন। তার কোন দোষ নেই। কিন্তু উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। বড় শাহজাদা কণ্টকমুক্ত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করল। রাজ্যে আগের মত শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হ'তে লাগল।

শিক্ষা : কুচক্রীদের শেষ পরিণতি সর্বদাই মন্দ হয়।

৪৯. আদর্শ পিতা-মাতার যোগ্য সন্তান

এক সৈনিক একবার তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে গেল। তখন তার স্ত্রী গর্ভবতী। যাবার সময় সে স্ত্রীর কাছে ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেল। এরপর বহু বছর কেটে যায়। যোদ্ধার ফেরার নাম নেই। অবশেষে দীর্ঘ ঊনত্রিশ বছর পর সে বাড়ি ফিরে আসে। ঘোড়া থেকে নেমে সৈনিক বর্শা নিয়ে ঘরের দরজায় আঘাত করলে এক টগবগে যুবক বেরিয়ে আসে। যুবক আগন্তুকের হাতে বর্শা দেখে বলল, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি আমার বাড়িতে হামলা করতে এসেছ? লোকটি একথা শুনে তাজ্জব বনে গেল। বলে কি এই যুবক! আমার বাড়ি এটা, অথচ সে কিনা আমাকেই ডাকাত বলে অভিহিত করছে? বীর সৈনিক গর্জে উঠে বলল, কে তুমি? তোমার সাহস তো কম নয়? আমার বাড়ির অন্দরে ঢুকে আমাকেই ডাকাত বলছ? একথা শুনে যুবকের চোখ ছানাবড়া হওয়ার জো। এই অচেনা-অজানা বুড়ো দেখি উড়ে এসে জুড়ে বসার মত কথা বলছে। এভাবে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেঁধে গেল তুমুল লড়াই। কেউ কাউকে ছাড়ার পাত্র নয়। তাদের লড়াই ও হুংকারে পাড়ার সব লোক এসে জড়ো হ'ল এবং কোনমতে তাদের থামাতে সক্ষম হ'ল। এবার সবাই যুবকের পক্ষ নিল। যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, একে কাযীর দরবারে সোপর্দ না করে কিছুতেই ছাড়ছি না। লোকটিও হুংকার ছেড়ে বলল, এই দুশ্চরিত্র ছেলেকে আমি বিচারালয়ে নিয়ে যাব। সেখানে যা হবার তাই হবে।

প্রতিবেশীরা লোকটির দৃঢ়তা দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তারা বলল, ভাই আপনি বোধ হয় বাড়ি চিনতে ভুল করেছেন। এই বাড়ি ওদেরই। ওরা বহুদিন

ধরে এখানে আছে। লোকটি বলল, হ'তেই পারে না। আমি ঠিক চিনেছি, এ বাড়ি আমার। আমি তো অমুক গোত্রের সর্দার। তখন বাড়ি থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে বলল, রাবী'আহ চুপ কর। উনি তোর বাবা, আমার স্বামী। মুহূর্তেই উত্তপ্ত পরিবেশ পাল্টে গেল। সন্তান পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, আব্বা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। লোকটিও ছেলেকে না চিনে নানা কথা বলায় লজ্জা পেল। ছেলে বলল, ঘরে চল বাবা, কিছু মনে কর না। ঘরে ঢুকে লোকটি স্ত্রীকে বলল, আমার ছেলে এত বড় হয়েছে? স্ত্রী বলল, হবে না। সেই কবে আপনি যুদ্ধে গিয়েছেন, ফিরলেন এতদিন পরে। লোকটি বলল, আমার সেই ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখেছ? এবার লোকটি একটি থলে এগিয়ে দিয়ে বলল, এখানে আরো চল্লিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা আছে, একসাথে রাখ। স্ত্রী বলল, সেগুলো আমি পুঁতে রেখেছি। কিছুদিন পর বের করব। যুবক মসজিদে গেলে স্ত্রী স্বামীকে ছালাত আদায় করতে মসজিদে পাঠিয়ে দিল। ছালাত শেষে লোকটি দেখল, মসজিদ চত্বরে বহু লোকের সমাগম। পাঠচক্র চলছে। কাছে গিয়ে দেখল, এক অল্প বয়সী যুবক জড়সড় হয়ে অধোমুখে দরস দিচ্ছে। আর বহু গণ্যমান্য আলেম-ওলামা একান্ত মনোযোগের সাথে তার দরস শুনছেন। লোকটি আশ্চর্য হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, কে এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? লোকটি বলল, তিনি হলেন মদীনা নগরীর সবচেয়ে বড় ফক্বীহ ইমাম রাবী'আতুর রায়। বাবা ছেলের পরিচয় পেয়ে যারপর নাই খুশি হ'লেন। হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য দো'আ করলেন ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আজ আমি তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যে অবস্থায় কেউ তার ছেলেকে দেখেনি। সত্যিই আমি সৌভাগ্যবান। স্ত্রী তখন হেসে বলল, আপনি এই ত্রিশ হাযার মুদ্রা চান, না এই ছেলেকে চান? আপনার রেখে যাওয়া ত্রিশ হাযার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমি এই সোনার ছেলে গড়েছি। আপনি খুশী হয়েছেন? তিনি বললেন, আজ আমার খুশির সীমা নেই। তোমার মত মহীয়সী মা যার আছে, তার এমনটি হওয়াইতো স্বাভাবিক। আমার কষ্টে অর্জিত অর্থ তুমি হকের পথেই ব্যয় করেছ। আল্লাহ তোমাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন!

শিক্ষা : আদর্শ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ মা।

৫০. হাতেম তাঈর মহত্ত্ব

হাতেম তাঈ দানশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর দানশীলতার সুনামে বাদশাহ নওফেল ক্রোধান্বিত হলেন। কারণ তিনিও একজন দাতা ছিলেন। কিন্তু হাতেমের দানের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। বাদশাহর দান হাতেমের দানের কাছে ম্লান ও নিষ্প্রভ। যেন চাঁদের আলোর কাছে তারার আলো। বাদশাহ শুধু এ কারণেই ক্রোধান্বিত হয়ে ফরমান জারী করলেন, 'যে কেউ হাতেমকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে'।

ঘোষণাটি হাতেমও শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর অবস্থানে থাকাটা নিরাপদ মনে করলেন না। তিনি এক গভীর জংগলে আত্মগোপন করে রইলেন।

পুরস্কারের লোভে অনেকেই হাতেমকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। এক কাঠুরে ও তার স্ত্রী হাতেমের লুকিয়ে থাকা জংগলে কাঠ কাটতে এলো। স্ত্রী বাদশাহর ঘোষণার কথা স্বামীকে শুনিয়ে বলল, 'আমরা যদি হাতেমকে পেতাম, তাহ'লে তাঁকে বাদশাহর নিকট হাযির করলে আমাদেরকে আর কাঠ কেটে খেতে হত না'। স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী মর্মাহত হ'ল এবং স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করল। কাঠুরে বলল, 'আমি এভাবে ধনী হ'তে চাই না। একজন সৎ ব্যক্তিকে বিপদে ফেলে আমি বড় হওয়াকে ঘৃণা করি'। স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী নীরব হয়ে রইল।

হাতেম স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'আমার এভাবে লুকিয়ে থাকায় সার্থকতা কি? বরং আমি কাঠুরেকে ধরা দিলে তারা আমাকে বাদশাহর নিকট হাযির করে পুরস্কৃত হয়ে উপকৃত হ'তে পারবে'। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে কাঠুরেকে ধরা দিলেন। কাঠুরে তাঁকে নিয়ে বাদশাহর নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালো।

এরই মধ্যে কতিপয় লোক হাতেমকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা হাতেমকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাদশাহর নিকট উপস্থিত করল এবং পুরস্কার দাবী করল। কি ঘটে তা জানার জন্য কাঠুরে ও তার স্ত্রী তাদের সাথে গেল। হাতেম বললেন, এই কাঠুরেই প্রথমে আমাকে ধরেছে। অতএব, পুরস্কার সেই পাবে। কাঠুরে বলল, 'না, আমি তাঁকে মোটেই ধরিনি। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের ধরা দিয়েছেন। যাতে আমরা তাঁকে আপনার নিকট হাযির করে পুরস্কার পেয়ে উপকৃত হই'। বাদশাহ কাঠুরের কথা শুনে বুঝলেন,

হাতেম যথার্থই একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তাই তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং কাঠুরেকে পুরস্কৃত করলেন।

শিক্ষা : দানশীলতা অতি উত্তম মানবিক গুণ। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে মর্যাদার পাত্র হয়। এটি পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অন্যতম মাধ্যম।

৫১. গণ্য-মান্য-নগণ্য-জঘন্য

আরব দেশের জনৈক সাহিত্যিক বর্ণনা করেন যে, আমি বাগদাদ নগরীর দেশবরেণ্য এক ধনী ব্যক্তির মজলিসে আমন্ত্রিত হ'লাম। আমি যাওয়ার পূর্বে শতাধিক ওলামায়ে কেরাম উক্ত মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিতিদের অনেকেই আমার পরিচিত ছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন অপরিচিত। দাওয়াতদাতা দশ বস্তা 'আখরোট' মঞ্চের সামনে উপস্থিত করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, দাওয়াতী মেহমানদেরকে 'আখরোট' দিয়ে বিদায় জানাবেন। ইতিমধ্যে উষ্কখুষ্ক চুলবিবিষ্ট আলখেল্লা পরিহিত এক পাগল এসে সভাপতির সামনে হাযির হ'ল। সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে অভিনব কৌশলে সভাপতিকে লম্বা সালাম ঠুকে বলল, 'মারহাবান বিকা ইয়া রাঈসাল হাফলাহ, মা হাযিহি'? 'মহামান্য সভাপতি! আপনাকে ধন্যবাদ। এগুলি কি'? সভাপতি তার বাক্যালাপের ভাব বুঝতে পেরে তাকে একটা আখরোট দিলেন। ফলটি পেয়ে পাগল খুশীতে বাগবাগ হয়ে একবার ফলের দিকে আর একবার সভাপতির দিকে তাকাতে লাগল।

অতঃপর সে আরেকটি ফল পাবার আশায় বেশ সুর-তাল দিয়ে দু'সংখ্যা বিশিষ্ট কুরআন মাজীদের এই আয়াতাংশ পাঠ করল, ثَانِيَ اثْنَيْنِ 'তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন' *(তওবা ৪০)*।

সভাপতি পাগলের তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দ্বিতীয় ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল পাবার প্রত্যাশায় গুরুগম্ভীর সুরে فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ 'অতঃপর আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে' *(ইয়াসীন ১৪)* এই আয়াতাংশ পাঠ করল। সভাপতি তার তেলাওয়াত শুনে খুশী হয়ে তাকে তৃতীয় ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল গ্রহণের জন্য আকর্ষণীয়

ভঙ্গিমায় কুরআন মাজীদের 'চার' সংখ্যা বিশিষ্ট একটি আয়াতাংশ তেলাওয়াত করল- فَخُذْ أَرْبَعَةً مِــنَ الطَّيْــرِ 'তাহলে চারটি পাখিকে ধর' *(বাক্বারাহ ২৬০)*। সভাপতিসহ মজলিসের সকলেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে ৪র্থ ফলটি দান করলেন। এমনি করে সে পঞ্চম ফলটি পাবার লক্ষ্যে 'পাঁচ' উল্লেখ আছে এমন আয়াতাংশ পাঠ করল, هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَــافٍ مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে পাঁচ হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন' *(আলে ইমরান ১২৫)*। সভাপতি তাকে ৫ম ফলটি প্রদান করলেন। এবার পাগল পঞ্চম ফলটি পেয়ে খুশীতে আটখানা হয়ে আরেকটি ফল গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'ছয়' সংখ্যা আছে এমন দু'টি আয়াতাংশ পাঠ করল, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُــلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ 'তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ' *(নিসা ১১)*। অন্যটি, اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّــامٍ 'আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন' *(সাজদাহ ৪)*। সভাপতি তার আয়াত পাঠে মুগ্ধ হয়ে তাকে ৬ষ্ঠ ফলটি প্রদান করলেন। লোভী পাগল লোভ সামলাতে না পেরে আরেকটি ফল পাবার উদ্দেশ্যে এক অভিনব সুরে কুরআন মাজীদের ঐসব আয়াত পাঠ করল, যার মধ্যে 'সাত' উল্লেখ আছে। যেমন- (১) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَــالٍ 'যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত্রি' *(হা-ক্কাহ ৭)*। (২) الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًــا 'তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন' *(মুলক ৩)*। অতঃপর সভাপতি তাকে ৭ম ফলটি প্রদান করলেন।

পাগল তো পাগলই, সে আরেকটি ফল পাবার প্রত্যাশায় এমন কতগুলি আয়াত পাঠ করতে লাগল যার মাধ্যে 'আট' উল্লেখ আছে। যেমন- (১) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ 'সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী' *(আন'আম ১৪৩)*। (২) وَثَــامِنُهُمْ كَلْــبُهُمْ 'তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর' *(কাহফ ২২)*। সামান্য একজন

পাগলের মুখ থেকে কুরআনের এতসব আয়াত শুনে সভাপতি তাকে ৮ম ফলটি প্রদান করলেন। পাগল আবারো আরেকটি ফল প্রাপ্তির আশায় 'নয়' উল্লেখ আছে এমন সব আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগল। যেমন- (১) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ 'আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১০১)*। (২) فِيْ تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ 'এগুলি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত' *(নামল ১২)*। সভাপতিসহ উপস্থিত সকলেই তার তেলাওয়াতে অভিভূত হয়ে তাকে নবম ফলটি দান করলেন।

পাগল এবারে কুরআন মাজীদের ঐ সব আয়াত পাঠ করতে লাগল, যেগুলিতে 'দশ' উল্লেখ আছে। যেমন- (১) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 'এভাবে দশটি ছিয়াম পূর্ণ হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। (২) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ ছওয়াব পাবে' *(আন'আম ১৬০)* ইত্যাদি। সভাপতি মুগ্ধ হয়ে তাকে 'দশম' ফলটি দিলেন। এতদসত্ত্বেও পাগলের লোভ থামল না। সে আরেকটি ফল পাবার আশায় 'এগার' উল্লেখ আছে এমন আয়াত পড়ল, إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا 'আমি এগারটি তারা দেখেছি' *(ইউসুফ ৪)*। সভাপতি তাকে একাদশ ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল পাবার আশায় 'বার' সংখ্যা উল্লেখ আছে এমন একটি আয়াত পাঠ করল। যেমন, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا 'আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম' *(মায়েদা ১২)*। সভাপতি পাগলকে দ্বাদশ ফলটি প্রদান করলেন।

এরপর পাগল চিন্তা করল এভাবে ১-২-৩ করে হবে না; বরং আরো বেশী করে নিতে হবে। এরপর সে আরো বেশী ফল প্রাপ্তির আশায় এমন এক আয়াত পাঠ করল যার মধ্যে 'বিশ'-এর উল্লেখ আছে। যেমন- إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকে' *(আনফাল ৬৫)*। সভাপতি তাকে বিশটি ফল দান করলেন।

পাগল আবারও অধিক ফল গ্রহণের জন্য সভার সমস্ত লোককে বিমোহিত করে এমন একটি আয়াত পাঠ করল, যেখানে ৫০ সংখ্যা উল্লেখ আছে। যেমন- إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًـــا 'তবে ৫০ বছর ছাড়া' *(আনকাবূত ১৪)*। সভাপতি আয়াত শুনে ৫০টি ফল প্রদান করলেন। পাগল এর চেয়ে বেশী নেওয়ার জন্য আরো কিছু আয়াত পাঠ করল, যাতে ১০০ সংখ্যার উল্লেখ আছে। যেমন- (১) فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন' *(বাক্বারাহ ২৫৯)*। (২) فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ 'প্রত্যেক শীষে একশ' করে দানা থাকে' *(বাক্বারাহ ২৬১)*। সভাপতি পাগলের মতলব বুঝে ১০০টি ফল দান করলেন। পাগল এবার ২০০ সংখ্যা বিশিষ্ট কুরআনের আয়াত পাঠ করল, يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ 'তবে তারা জয়ী হবে দু'শ ব্যক্তির উপর' *(আনফাল ৬৬)*। সভাপতি আয়াত শুনে ২০০ ফল প্রদান করলেন। পাগল আবারো অধিক পরিমাণে ফল লাভ করার জন্য ৫০ হাযার সংখ্যার আয়াত পাঠ করে বিমোহিত করল। যেমন- كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَـــنَةٍ 'যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছর' *(মা'আরিজ ৪)*। সভাপতি তাকে সবশেষে আখরোটের দশ বস্তা ফল দিয়ে বললেন, নাও পেটুক, তুমি একাই সব খাও।

পাগল জবাবে বলল, মাননীয় সভাপতি! আপনি আমাকে বদদো'আ দিচ্ছেন কেন? আমি তো কুরআনের আয়াত পাঠ করেই আপনাদের উপকার করছিলাম। আপনি যদি বিরক্ত না হ'তেন, তাহলে আপনার নিকট থেকে এভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ পাঠ করে লক্ষাধিক ফল গ্রহণ করতাম *(ছাফফাত ৩৭/১৪৭)*।

অতঃপর পাগল সভাপতিকে লক্ষ্য করে বলল, মহামান্য সভাপতি! আমি সম্বলহীন একজন পবিত্র কুরআনের হাফেয ও নিঃস্ব গরীব। এইভাবে পাগলের বেশে আমি নিজের জীবিকা অন্বেষণ করে থাকি। এই ভরা মজলিসে আপনারা সকলেই গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আর আমি নগণ্য-জঘন্য। আমার পরিচয় আপনারা কেউ নিলেন না। এই বলে সে মজলিস ত্যাগ করে বিদায় নিল। **শিক্ষা :** প্রতিভা আল্লাহ্র দান। বাহ্যিক বেশ-ভূষায় অনেক সময় জ্ঞানী ব্যক্তিকে চেনা যায় না।

৫২. উচিত জবাব

একবার এক নাস্তিক এক দরবেশের কাছে এসে চারটি প্রশ্নের জবাব জানতে চেয়ে বলল, আপনি যদি আমাকে এ চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। প্রশ্ন চারটি হ'ল :

(১) বলা হয় যে, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা। যদি তাই হয়, তবে আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন?

(২) না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করার কথা বলা হয় কেন?

(৩) ইবলীস তথা জিন জাতি আগুনের তৈরী। সুতরাং ওরা জাহান্নামের আগুনে কিভাবে পুড়বে? অর্থাৎ আগুনকে আগুন দিয়ে কিভাবে পোড়ানো যাবে?

(৪) বলা হয় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তাই যদি হয়, তবে মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে কেন?

দরবেশ প্রশ্নগুলো শুনে নাস্তিক লোকটিকে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে পার্শ্বে পড়ে থাকা একটি মাটির ঢেলা হাতে নিয়ে ঐ নাস্তিক লোকটিকে ছুঁড়ে মারলেন। এতে লোকটির মাথায় আঘাত লেগে ফেটে গেল। তখন দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তোমার চারটি প্রশ্নের জবাব।

অতঃপর মাটির ঢেলার আঘাতে আহত নাস্তিক লোকটি আদালতে গিয়ে কাযীর দরবারে দরবেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কাযী ঐ নাস্তিকের বিবরণ শুনে দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এভাবে মারলেন কেন'?

উত্তরে দরবেশ বললেন, এ হচ্ছে তার চারটি প্রশ্নের সঠিক জবাব। এর দ্বারা তাকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ঢিল ছুঁড়ে কিভাবে প্রশ্ন চারটির জবাব দেওয়া হ'ল, এ রহস্য উদঘাটন করার অনুরোধ করা হ'লে দরবেশ বললেন, লোকটির প্রথম প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা অথচ তাঁকে দেখা যায় না কেন? জবাব হ'ল, ঢিলের আঘাতে এ ব্যক্তি ব্যথা পাওয়ার কথা

বলছে। এর অস্তিত্ব কোথায়? ব্যথার যদি অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা দেখা যায় না কেন? ব্যথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেমন তা চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহ অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চর্মচোখে দেখা যায় না।

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করব কেন?

চোখে না দেখে যদি ব্যথার কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে অসুবিধা কোথায়?

তার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল- শয়তান ও জিন আগুনের তৈরী হয়েও জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কিভাবে? উত্তর : মানুষও মাটির তৈরী। মাটির তৈরী মানুষকে যদি মাটির ঢেলার আঘাতে ব্যথা দেওয়া যায়, তবে আগুনের তৈরী জিনকে আগুনে পোড়ানো যাবে না কেন?

তার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল- আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না, তাহ'লে মানুষের কৃতকর্মের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

উত্তর : আল্লাহ্র ইচ্ছায় যখন সবকিছু হয়, তবে ঢিল ছুঁড়া, তার গায়ে আঘাত লাগা, রক্তপাত ও ব্যথা সবইতো তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আদালতে অভিযোগ করার কি আছে? এর যদি অভিযোগ ও বিচার চলে এবং শাস্তি বর্তায়, তবে মানুষের কৃতকর্মের বিচার, সুফল ও কুফল ভোগ কেন মিথ্যা হবে?

দরবেশের এ অভিনব জবাব শুনে নাস্তিক লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

শিক্ষা : 'আল্লাহ আরশে সমাসীন' *(ত্বো-হা ৫)*। তিনি সেখান থেকে গোটা সৃষ্টিজগত পরিচালনা করছেন। তাঁর এখতিয়ারের বাইরে কোন কিছুই নেই। তাঁকে না দেখে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। সবকিছুই তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি 'কুন' (হও) বললেই হয়ে যায়। তিনি অসীম, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সসীম ও অপূর্ণ জ্ঞান দিয়ে তাঁর সৃষ্টির বিশালত্বকে আয়ত্ব করতে যায় বলেই নাস্তিকরা বিভ্রান্ত হয়।

৫৩. সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ তার গুহায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটি ছোট ইঁদুর ছোটাছুটি করতে করতে সিংহের নাকের এক ছিদ্রে ঢুকে পড়ল। ফলে সিংহের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ইঁদুরটিকে থাবা দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে উদ্যত হ'ল। ইঁদুরটি অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বলল, দয়া করে আমাকে মেরে ফেলবেন না। সময়ে আমিও আপনার উপকারে আসতে পারি। একথা শুনে সিংহটি হেসে বলল, তুই এত ছোট জীব হয়ে আমার কি উপকার করবি? যাক সিংহটি তাকে ছেড়ে দিল।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সিংহটি একটি দড়ির শক্ত ফাঁদে আটকে গেল। ফাঁদে পড়ে সিংহটি ভীষণ গর্জন করতে লাগল। গর্জন শুনে ইঁদুরটি দৌড়ে সেখানে গেল। সিংহের বিপদ দেখে সে তার কানের কাছে গিয়ে তাকে গর্জন করতে নিষেধ করল। কারণ যারা ফাঁদ পেতে রেখেছে তারা গর্জন শুনে ছুটে আসতে পারে। ইঁদুরটি এবার তার কাজ শুরু করল। সে তার দাঁত দিয়ে ফাঁদের দড়ি কাটতে শুরু করল। অবশেষে সে সিংহকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করল। মুক্তি পেয়ে সিংহটি ইঁদুরকে ধন্যবাদ দিল এবং সেই সংগে বলল, 'তোকে আমি অবজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু বুঝলাম, কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই'।

শিক্ষা : ছোট বলে কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই। বিপদে যে কেউ উপকারে আসতে পারে।

৫৪. শিকারী ও ঘুঘু

নদীর তীরের একটি গাছের উঁচু ডালে একটি ঘুঘু বসে নদীর পানির দিকে চেয়ে আছে। সে দেখতে পেল, একটি পিঁপড়া নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পিঁপড়ার প্রতি তার দয়া হ'ল। তাই সে গাছ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পিঁপড়ার সামনে ফেলে দিল। পিঁপড়াটি পাতায় চড়ে প্রাণে বেঁচে গেল।

পিঁপড়াটির বাসা ঐ গাছের কাছেই। একদিন সে গাছে ঘুঘুটি বসে রয়েছে। এক শিকারী ঘুঘুকে লক্ষ্য করে তার ধনুকে তীর সংযোগ করল। সে তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে, এমন সময় ঐ পিঁপড়াটি এসে তার পায়ে শক্ত কামড় বসিয়ে

দিল। কামড়ের চোটে সে জোরে 'উহ' করে উঠল। পাখীটি শব্দ শুনে উড়ে গেল। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল।

শিক্ষা : বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।

৫৫. যোগ্য পাত্র নির্বাচন

সুলতান ইবরাহীম বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। সুলতান বুঝতে পারলেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর চিন্তা যে, একমাত্র কন্যা জাহানারার এখনও বিয়ে হয়নি। রাজকন্যা সুন্দরী, তার বিয়ের বয়স হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকেই তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তার যোগ্য বর আজও খুঁজে পাননি সুলতান। একদিন সুলতান কন্যা জাহানারাকে ডেকে বললেন, মা, এবার আমি তোমার বিয়ে দেব। রাজকন্যা বললেন, কিন্তু তুমি কিভাবে বর নির্বাচন করবে বাবা?

সুলতান বললেন, আমার কোন পুত্রসন্তাই নেই। তোমার স্বামীই হবে আমার এই রাজ্যের ভাবী সুলতান। যে ভালভাবে রাজ্য শাসন করতে পারবে এবং প্রজাপালন করতে পারবে আমি তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব।

রাজকন্যা বললেন, কিন্তু তুমি কিভাবে যোগ্য বরকে নির্বাচন করবে?

সুলতান বললেন, সে ব্যবস্থা আমি করব। আগে যারা রাজকন্যার বিয়ের জন্য এসেছিল, তাদের মধ্যে তিনজনকে যোগ্য বর হিসাবে মনে মনে বাছাই করেছিলেন সুলতান। তিনি একদিন দূত পাঠিয়ে তিনজন যুবরাজকে ডেকে আনলেন রাজসভায়। তিনজন যুবরাজই ছিলেন বয়সে যুবক এবং বীর। তাদের নাম ছিল খালিদ, যুবায়ের ও ছাবিত। তিনজনই ছিল দেখতে সুদর্শন এবং আচরণ ও কথা-বার্তায় ভদ্র।

রাজকন্যা বুঝে উঠতে পারল না, সে কিভাবে এই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্বামী হিসাবে বাছাই করবে। তাই সে তার বাবার উপর বর নির্বাচনের ভারটা ছেড়ে দিল।

যুবরাজ তিনজন সুলতানের সামনে হাযির হ'লে সুলতান বললেন, আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। কারণ, আমি এবার আমার কন্যাকে পাত্রস্থ করতে চাই।

যুবরাজ তিনজন হাসিমুখে মাথা নত করল।

সুলতান বললেন, তোমরা তিনজন আমার রাজ্য শাসনের উপযুক্ত। ভবিষ্যতে তোমরা সুলতান হ'তে পার। কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজনের হাতে আমার কন্যাকে অর্পণ করতে হবে। তাই আমি তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছি। আজ পূর্ণিমা। আজই তোমাদের এক মাসের জন্য দেশ ভ্রমণে পাঠাতে চাই। আজ হ'তে ঠিক এক মাস পরে পূর্ণিমায় তোমরা সফর শেষে ফিরে আসবে এই রাজসভায়। তোমরা প্রত্যেকেই রাজকন্যার উপযুক্ত বিবেচনা করে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার নিয়ে আসবে। সে উপহারের গুণাগুণ বিচার করেই তোমাদের যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে। যুবরাজ তিনজন আশান্বিত হয়ে সেদিনই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

চোখের পলকে একটি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। পরের মাসে আবার পূর্ণিমা এল। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠতেই সুলতানের প্রাসাদ দ্বারে যুবরাজদের আগমন বার্তা ঘোষণা করা হ'ল। আলোকমালা ও ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হ'ল সমস্ত প্রাসাদ।

সুলতান প্রথমে যুবরাজ খালিদকে ডেকে বললেন, তুমি আমার কন্যার জন্য কি উপহার এনেছ? যুবরাজ খালিদ নতজানু হয়ে একটি বড় থলে থেকে অনেক বড় বড় মূল্যবান জিনিস বের করল। তারপর সুলতানকে বলল, এগুলি সবচেয়ে দামী হীরা, মুক্তা, পান্না ও চুন্নি। এগুলি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বাছাই করে এনেছি। এগুলি দিয়ে রাজকন্যার জন্য একটি মুকুট, গলার হার, হাতের বালা আর আংটি বানাতে চাই। হাসিমুখে খুশি হয়ে মাথা নত করল রাজকন্যা জাহানারা। কিন্তু সুলতান কোন কথা বললেন না।

এবার সুলতান যুবরাজ যুবায়েরকে ডেকে বললেন, তুমি কি উপহার এনেছ? যুবায়ের বলল, 'আমি একটি বন্দুক এনেছি। এটি এক শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে অনায়াসে এবং অব্যর্থভাবে লোক মারা যায়। এই অস্ত্র কাছে থাকলে বাইরের কোন শত্রু ভয়ে পা দেবে না আপনার রাজ্যের ত্রিসীমানায়। আপনি এর দ্বারা অনেক দেশ জয় করতেও পারেন। আপনি হয়ে উঠতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিজয়ী রাজা।

যুবরাজ যুবায়েরের কথা শুনে রাজকন্যা কেঁপে উঠলেন ভয়ে। সুলতান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীরবে। কিন্তু রাজসভায় উপস্থিত লোকদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এবার যুবরাজ ছাবিতকে ডাকলেন সুলতান। লজ্জাবনত মুখে সুলতানের সামনে খালি হাতে এসে দাঁড়াল যুবরাজ ছাবিত। সে বলল, ক্ষমা করবেন সুলতান, আমি রাজকন্যার জন্য কোন উপহার আনতে পারিনি।

সুলতান আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি? কোন উপহারই আননি?

ছাবিত বলল, আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাই। অথচ তার জন্য কোন উপহার না আনতে পারায় সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এই একটি মাস আমি কাজে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, কোন উপহার যোগাড় করার ফুরসৎ পাইনি।

একথার অর্থ বুঝতে না পেরে সুলতান বললেন, কি কাজে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে?

ছাবিত বলল, আমি আপনার রাজসভা থেকে বেরিয়ে দেশ ভ্রমণে যাবার সময় পথে এক মুমূর্ষু পথিককে দেখতে পাই। তার গা থেকে রক্ত ঝরছিল। সর্বাঙ্গ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। আমি তা দেখে চলে যেতে পারলাম না। তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে দু-একদিন পর আবার পথ চলতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখলাম, একদল নারী ও শিশু ভয়ার্ত অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম, একদল জলদস্যু নদী পথে এসে তাদের গ্রাম লুণ্ঠন করেছে, গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষকে হত্যা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং আবার আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে। আমি তাদের বুঝিয়ে গ্রামে ফেরত নিয়ে গেলাম। দেখলাম গ্রামের অল্পসংখ্যক লোক যারা বেঁচে আছে তারা জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। কিন্তু কোন যোগ্য নেতা না থাকায় মনোবল পাচ্ছে না। আমি সে সব নিঃস্ব অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত লোকদের ফেলে চলে আসতে পারলাম না। তাদের সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ করে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলাম। জোর লড়াই করে জলদস্যুদের ঘায়েল করে গ্রাম থেকে চিরদিনের মত বিতাড়ন করলাম।

তারপরও অনেক কাজ ছিল। আহতদের চিকিৎসা, বিধবা ও শিশুদের পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজগুলি সারতে আমার বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেল। কাজের চাপে আমি উপহারের কথা, রাজকন্যার কথা সব ভুলে গেলাম। হঠাৎ একদিন আকাশে চাঁদ দেখে পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই ক্ষমা চাইতে এলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন সুলতান।

যুবরাজ ছাবিতের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ সুলতান। তিনি যখন চোখ তুললেন তখন দেখা গেল, চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। রাজকন্যার চোখও পানিতে ছলছল।

সুলতান যুবরাজ ছাবিতকে তার কাছে ডাকলেন। যুবরাজের একটি হাত ধরে হাসিমুখে বললেন, এই মহান যুবরাজ রাজকন্যার জন্য উপহার না নিয়ে এলেও এ হাতে ফুটে আছে জনসেবার অনেক অমূল্য নিদর্শন। আমি তারই হাতে তুলে দেব আমার কন্যাকে। এই মহানহৃদয় পরোপকারী যুবরাজই হবে আমার রাজ্যের উপযুক্ত শাসক।

শিক্ষা : অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা-প্রভাব দেখে নয়, চরিত্রবান পাত্র দেখে কন্যাকে বিয়ে দিতে হবে।

৫৬. একজন পরোপকারী অফিস প্রধান

আব্দুল হালীমের স্ত্রী রাবেয়া একজন বিদুষী, পতিপরায়ণা এবং অন্যান্য সদগুণে গুণান্বিতা নারী। আব্দুল হালীমও একজন চরিত্রবান যুবক। সে যে অফিসে কাজ করে সে অফিসের অন্যান্য ব্যক্তি ও কর্মচারীরাও সৎ এবং মানবদরদী। কর্তব্যে তাকে কোন দিন অবহেলা করতে দেখা যায় না। এজন্য অফিস প্রধান তার প্রতি অতি প্রসন্ন।

আব্দুল হালীমের বিবাহিত জীবনের ছ'বছর পর তাদের ঘরে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ফলে তাদের নিরাশার জীবনে আশার সঞ্চার হয়।

সদা প্রফুল্ল এবং কাজে একনিষ্ঠ আব্দুল হালীমকে সন্তান লাভের পর আর পূর্বের মতো দেখা যায় না। তার হাসিমুখে বিষাদের ছায়া বিরাজমান। সে যেন বড় রকমের কোন এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছে। সে সত্যি সত্যি একটি

যন্ত্রণার শিকার। তার সন্তানটি হার্টে একটি ছিদ্র নিয়ে জন্মেছে। ফলে সে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না। হার্ট অপারেশন ছাড়া এর কোন বিকল্প নেই। আর এ কাজে অন্ততঃ ৩/৪ লাখ টাকা প্রয়োজন। এ অপারেশন দেশেও হবে না। এতো টাকা আব্দুল হালীমের নেই এবং এতো টাকার সম্পদও নেই। তাই তার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

স্ত্রী রাবেয়া এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এতো টাকা সংগ্রহ করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তাই চিকিৎসার অভাবে তাদের বহুদিনের প্রত্যাশিত ধনকে ধুকে ধুকে তার চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করতে হবে ভেবে সে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়।

আব্দুল হালীমের বোন তাসনীম ভাইয়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া করে। ভাইয়ের আশা বোন উচ্চশিক্ষিতা হ'লে তাকে একজন ভাল পাত্রের হাতে তুলে দিবে। তাসনীম শিশুটির অবস্থা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছে। তাই সে একদিন ভাবীকে ডেকে বলল, 'ভাবী, আমি আর পড়াশুনা করব না। বাড়ী চলে যাব'। হঠাৎ করে ভাবী তার এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমি তোমাদের আর খরচ বাড়াতে চাই না। তোমরা আমার জন্য যে খরচ কর, তা বাঁচিয়ে শিশুটির চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোল'।

ভাবী তাকে তার এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে বলে এবং বলে, 'তুমি এ সিদ্ধান্ত তোমার ভাইকে কখনো বলো না। তাহলে তিনি দারুণ কষ্ট পাবেন। আমরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছি, আমরা তাকে সুস্থ করে তুলতে পারব না। তার মৃত্যু অবধারিত। কারণ চিকিৎসার অত টাকা আমরা কোথায় পাব'?

রাবেয়ার শাশুড়ীর নামে কিছু সম্পত্তি আছে। নাতির চিকিৎসার জন্য তিনি তা বিক্রি করে দিতে চান। কিন্তু আব্দুল হালীম তাতে সম্মত নয়। কারণ সে সম্পত্তির উৎপন্ন ফসলে মাতা-পিতার কোনমতে দিন কাটে। তাছাড়া সে সম্পত্তি বিক্রি করেও চিকিৎসার পুরো খরচ জোগাড় হবে না।

একদিন অফিসের প্রধান কর্মকর্তা আব্দুল হালীমকে তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে তার এ মানসিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। আব্দুল হালীম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সন্তানের বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। তার বস তাকে বলেন,

'আমরা সকলে মিলে তোমার সন্তানের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য করব এবং প্রয়োজনে ভিক্ষা চাইব। একটি নিষ্পাপ শিশুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখব। আব্দুল হালীম এতে আপত্তি করে। সে বলে, 'আমার জন্য আপনি অন্যের কাছে হাত পাতবেন, এটা হ'তে পারে না। আমি আমার স্বার্থে আপনাকে এভাবে মানুষের কাছে ছোট হ'তে দিতে পারি না'।

প্রধান কর্মকর্তা বলেন, 'আমি যদি তোমার এ বিপদে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পাশে না দাঁড়াই, তাহ'লে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আমি তোমার কোন আপত্তি মানতে রাযী নই। একাজ আমার দায়িত্ব বলে মনে করি'।

একদিন বিকেলে অফিসের প্রধান কবীর ছাহেব আব্দুল হালীমের বাসায় এসে আব্দুল হালীমের সন্তানকে দেখলেন। তিনি শিশুর ফটোর একটি নেগেটিভ কপি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় শিশুটির ছবি ছাপিয়ে তার অসুখের বিবরণ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে আবেদন জানালেন। এতে কাজ হ'ল।

আব্দুল হালীম শিশুর চিকিৎসার জন্য স্ত্রীসহ বিদেশ যাত্রা করতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হ'লে তাদের বিদায় জানাতে আসলেন অফিসের প্রধান কবীর ছাহেব, সহকর্মী আবিদ হাসান এবং অন্যান্য দাতা ব্যক্তিরা। সবাই আল্লাহ্‌র কাছে শিশুটির আরোগ্য কামনা করে তাদের বিদায় জানালেন।

শিক্ষা : অসহায়-দুঃস্থ মানুষকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা আমাদের প্রত্যেকেরই ইমানী ও নৈতিক দায়িত্ব।

৫৭. আল্লাহ যা করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্য করেন

প্রাচীন কালে পারস্যে এক বদমেযাযী রাজা ছিলেন। একদিন চেরী কাটতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙ্গুলের ডগা কেটে গেল। প্রচুর রক্তক্ষরণে রাজা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। উযীরে আ'যম সংবাদ পেয়ে রাজাকে দেখতে গেলেন। উযীরে আ'যম ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। রাজার এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লা-হ; আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। এতে রাজা উযীরের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হ'লেন। ভাবলেন, ভীষণ

ব্যথা ও প্রচুর রক্তক্ষরণে আমি শয্যাশায়ী, আর সে বলে 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। বেটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা উযীরের ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ ছিল। তাই সরাসরি তাঁকে শাস্তি দিলে ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিতে পারে ভেবে রাজা মনে মনে অন্য ফন্দি আঁটলেন।

রাজা সুস্থ হয়ে মন্ত্রী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে একদিন শিকারে বের হ'লেন। সাথে উযীরে আ'যমকেও নিলেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উযীরে আ'যমকে এক অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়ে তাঁরা শিকারে মনোনিবেশ করলেন। অতঃপর রাজা এক মায়া হরিণের মায়ায় পড়ে হরিণটি শিকার করার জন্য ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন। রাজার ঘোড়া এমন দ্রুত দৌড়াচ্ছিল যে, সাথীরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারছিল না। দৌড়াতে দৌড়াতে রাজা রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে ঢুকে পড়লেন। এদিকে ঐ রাজ্যের রাজার খুবই প্রিয় একটি ঘোড়া ছিল। কয়েকদিন আগে জনৈক চোর ঘোড়াটি চুরি করে পারসিক এই রাজার নিকট বহুমূল্যে বিক্রি করেছিল। আর সেই ঘোড়াটি নিয়েই পারস্যের রাজা শিকারে বের হয়েছিলেন। এদিকে ঐ রাজার সৈন্যবাহিনীও ঘোড়ায় সওয়ার রাজাকে চিনতে পেরে তাকে বন্দী করে কয়েদখানায় প্রেরণ করে।

ঐ দেশের রাজা ছিল প্রতিমা পূজারী। সেদেশের প্রথা ছিল প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে সুদর্শন, সুঠামদেহী, নিখুঁত একজন লোককে তাদের দেবতার নামে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বলি' দেয়া। অধিকাংশ সময় সে লোক সরবরাহ করা হ'ত কয়েদখানা হ'তে। আর এ সময়টি ছিল তাদের সেই বলি অনুষ্ঠানের সময়। তাই সুদর্শন, সুঠামদেহী কয়েদী রাজাকে মনোনীত করা হ'ল 'বলি' দেয়ার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে কয়েদী রাজাকে বলির মঞ্চে হাযির করা হ'লে সেদেশের রাজা কয়েদীর সারা শরীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন কোন খুঁত আছে কি-না তা দেখার জন্য। অতঃপর কয়েদীর হাতের আঙ্গুল কাটার দাগ দেখতে পেয়ে রাজা বললেন, এটা বলি দেয়ার উপযুক্ত নয়। অন্য একজনকে খুঁজে আন।

এমন সময় কয়েদী (পারস্যের রাজা) বললেন, উযীরের কথাই সত্যি হ'ল, 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। এ কথা শুনে ঐ দেশের

রাজা জিজ্ঞেস করল, কি বললে তুমি? একথার মর্মার্থ কি? তখন পারস্যের রাজা তাঁর পরিচয়সহ সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কয়েদীর পরিচয় ও ঘটনা শুনে সে দেশের রাজা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'আপনার উযীর ঠিকই বলেছে'। অতঃপর সসম্মানে পারস্যের রাজাকে মুক্তি দেয়া হ'ল এবং ঘোড়াটিও তাঁকে উপহার দেয়া হ'ল।

মুক্তি পেয়ে পারস্যের রাজা রাজ্যে ফিরে এসে প্রথমেই উযীরে আ'যমের খোঁজে সেই অন্ধকার কূপের নিকট গিয়ে দেখলেন, উযীর এখনও বেঁচে আছে এবং পাশেই বসবাস করছে। রাজা উযীরে আ'যমকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমাকে ভুল বুঝে তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাই। তুমি সত্যিই বলেছিলে, আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। যদি আমার আঙ্গুলে কাটার দাগ না থাকত তবে আজ আমি মৃত্যুর রাজ্যে চলে যেতাম'। তখন উযীরে আ'যম বললেন, আপনার দেয়া শাস্তিকে আমি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলাম এজন্য যে, আমি বিশ্বাস করি 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'। ভেবে দেখুন, আপনি যদি আমাকে কূপের মধ্যে না ফেলতেন তবে আমি কিছুতেই আপনার পিছু ছাড়তাম না। ফলে সে দেশের সৈন্যবাহিনীর হাতে আপনার সাথে আমিও বন্দী হ'তাম এবং আমাকেই তাদের প্রথানুযায়ী 'বলি' দেয়া হ'ত। কারণ আমার শরীরে কোন খুঁত নেই।

শিক্ষা : সকল বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে ধৈর্যের সাথে বিপদ-মুছীবতকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে এবং সর্বদা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন'।

৫৮. প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায়

আরবের কোন এক পাহাড়ী অঞ্চলে একদল দস্যু একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে বসবাস করত। কোন কাফেলা ঐ পথে যাত্রা করলেই তারা তাদের উপর চড়াও হ'ত। লুট করে নিত তাদের সমুদয় সম্পদ। আক্রমণ করত পথচারীদের উপর। এদের ভয়ে শহরের জনসাধারণ সর্বদা তটস্থ থাকত। কারণ তারা পর্বতশৃঙ্গে নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছিল। আর এজন্যই রাজার

সেনাবাহিনীও এদের সঙ্গে পেরে উঠছিল না। ঐ অঞ্চলীয় রাষ্ট্র প্রশাসন দস্যুদের কবল থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য পরামর্শ করল। কেউ কেউ বলল, দস্যুদল এভাবে যদি আর কিছুকাল অবস্থান করে তবে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কবি বলেন,

'যে বৃক্ষ সবেমাত্র গেড়েছে শিকড়
উপড়াতে পারবে কেহ দিয়ে স্বল্প জোর।
ঐ অবস্থায় রাখে যদি আর কিছুকাল
জন্মেও পারবে না তুলতে, হবে বিফল।
অল্প পানির গতি বন্ধ কর থোড়া চীযে
পূর্ণ জোরে চললে হস্তিও ভেসে যাবে নিজে'।

অতঃপর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের অনুসন্ধান করার জন্য একজন গুপ্তচর ঠিক করা হ'ল। যে সব সময় তাদের দিকে নযর রাখত। একদা দস্যুদল কোন এক কাফেলার উপর আক্রমণ করতে গেলে তাদের আস্তানা সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। এ সংবাদ অবহিত হয়ে যুদ্ধে পারদর্শী কয়েকজন বীরপুরুষকে তথায় পাঠানো হয়। তারা পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় আত্মগোপন করে ওঁৎ পেতে থাকে। গভীর রাতে দস্যুদল লুট করে মালামাল নিয়ে ফিরে এসে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। আর এ নিদ্রাই হয় তাদের কাল।

যখন রাত্রি আরো গভীর হ'ল। দস্যুদলও ঘুমে বিভোর। তখন বীর সিপাহীগণ তাদের গুপ্তঘাঁটি আক্রমণ করল এবং এক এক করে সকল দস্যুর হস্ত কাঁধে বেঁধে ফেলল। সকাল বেলা তাদের সবাইকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হ'ল। রাজা বিনাদ্বিধায় তাদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন।

দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন সুন্দর যুবক রয়েছে, যে কেবলমাত্র নব যৌবনে পদার্পণ করেছে। তার গণ্ডদেশ কানন কেবলমাত্র নতুন সবুজ মেলায় ভরে উঠেছে। জনৈক মন্ত্রী উক্ত যুবকের জন্য সুফারিশ করে বললেন, হে সম্রাট! এই সুন্দর ছেলেটি তার জীবন কানন হ'তে এখনও কোনরূপ ফল ভোগ করেনি। তার নব যৌবন হ'তে উপকৃত হয়নি। সম্রাটের উন্নত স্বভাব ও

দানশীলতায় আমি আশাবাদী, অনুগ্রহ করে তার খুন মাফ করে দিয়ে অধমের উপর অনুকম্পা করবেন। বাদশাহ মন্ত্রীর কথা শুনে বিমুখ হ'লেন এবং তাঁর রায়ের অনুকূল না হওয়ায় বললেন,

'কু-জাত লভেনা কভু সুজনের শিক্ষা
গোলের উপর গোল যেন অযোগ্যের দীক্ষা'।

এদের বংশ-বুনিয়াদ নির্মূল করাই উত্তম। কেননা অগ্নি নির্বাপিত করে আংটা রাখা, সাপ মেরে উহার বাচ্চা পালন করার ন্যায়, যা জ্ঞানীদের কাজ নয়।

'মেঘে যদি দেয় ঢেলে হায়াতের পানি
ঝাউ গাছে ফুল কভু পাবে নাকো জানি।
দুষ্টের সাথে কাল কর না ক্ষেপণ
নলখাগড়া হ'তে চিনি পাবে না কখন'।

মন্ত্রী বাদশার এসব কথা শ্রবণ করলেন। সুন্দর অভিমতের জন্য বাদশাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, বাদশাহ যা বলেছেন সম্পূর্ণ সত্য। তবে ছেলেটি এখনও ছোট। যদি সে ঐসব দস্যুদের শিক্ষা পেত তবে তাদের আচরণ গ্রহণ করতো এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হ'ত। অধম বান্দার অভিলাষ এই যে, সে সৎ লোকদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। চরিত্রবান হবে। কারণ দস্যুদের সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহী আচরণ এখনো হয়ত তার অন্তরে প্রোথিত হয়নি। হাদীছে বর্ণিত আছে, 'প্রতিটি সন্তান ইসলামী ফিৎরাতের উপর জন্ম লাভ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-নাছারা বা অগ্নিপূজক বানায়'। মন্ত্রী তার উক্তির পিছনে এই সব যুক্তি পেশ করলেন।

'নূহ (আঃ) পুত্র যখন বদের সঙ্গী হ'ল
নবুঅতী বংশ তাঁর ধ্বংস হয়ে গেল।
গুহাবাসীদের কুকুর দেখ মাত্র কয়েকটি দিন
পুণ্যবানদের অনুসরণে হইল মানবাধীন'।

মন্ত্রী একথা বলার পর বাদশাহ্র নিকটজনদের মধ্য হ'তে আরো কিছু লোক মন্ত্রীর সাথে সুফারিশে শরীক হ'লেন। তখন বাদশা এই বলে তার খুন মাফ করে দিলেন যে, ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু ভাল মনে করলাম না।

‘জান না কি বলেছিল মহিলাটি বীর রোস্তমকে
নিরুপায় নিকৃষ্ট জান না কভু শত্রুকে।
বহু দেখেছি অল্প পানির স্বল্প স্রোতের টানে
প্রবল হ’লে উট বোঝা ভেসে গেছে বানে’।

অতঃপর মন্ত্রী তার দলবলসহ ছেলেটিকে মহাআনন্দ ও পুরস্কারের সাথে বের করে নিয়ে এলেন। তার শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হ’ল। সুন্দর বক্তব্য, প্রশ্নের জবাব, বাদশাহ্র খেদমতে আদব ইত্যাদি বিষয় তাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়া হ’ল। সকলের দৃষ্টিতে ছেলেটি আদরের পাত্রে পরিণত হ’ল। একদা মন্ত্রী বাদশাহর খেদমতে তার সৎ চরিত্র বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, জাঁহাপনা! জ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তার জন্মগত পুরাতন অজ্ঞতা বিদূরিত হয়েছে। বাদশাহ এটা শুনে মুচকি হেসে বললেন,

‘সিংহ শাবক পরিশেষে সিংহ হয়ে যায়
যদিও মানুষের সাথে বুযরগী সে পায়’।

দু’বৎসর এভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যেই মহল্লার একদল দুর্বৃত্ত তার সাথে মিলিত হয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন এঁটে নিল। তাদের প্ররোচনায় ছেলেটি বাপ-চাচাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হ’ল। একদা সুযোগ বুঝে মন্ত্রী ও তার দুই পুত্রকে হত্যা করল এবং বহু সম্পদ লুটে নিয়ে সেই পুরাতন পর্বত গুহায় গিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ’ল। এ সংবাদ পেয়ে বাদশাহ পরিতাপের সাথে দাঁত দিয়ে আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে বললেন,

‘কাঁচা লোহায় পাকা অস্ত্র বানায়না কেউ কভু
অমানুষকে শিক্ষা দিলেই হয়না মানব তবু
পাক বৃষ্টির পানিতে ভাই নাইকো কোন নাশ
ফুল বাগানে ফুল ফোটে আর পতিত যমীনে ঘাস’।

....

‘কু-লোকের ভাল করা জানিবে কেমন
সু-লোকের মন্দ করার পরিণাম যেমন’।

শিক্ষা : ইল্লত যায় না ধুলে, আর খাছলত যায় না মলে।

৫৯. গুপ্তধন

জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে মারা যান। ছেলেরা সবাই বিবাহিত। মেয়ের বিয়ে আগেই হয়েছে। তারা সবাই সন্তান-সন্ততির মা-বাবা হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ছেলেরা পৃথক হয়ে যায়। ছোট ছেলের মায়ের প্রতি একটু বেশি ভালবাসা বুঝে মা ছোট ছেলের সাথে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

মায়ের সোনার চুড়ি পরার খুব সখ ছিল। স্বামী তার সে সখ পূরণ করতে পারেননি। তাই ছোট ছেলে মাকে সোনার চুড়ি বানিয়ে দেয়। মা এতে ভীষণ খুশী হন। ছোট ছেলে মাকে আদর-যত্নে রাখে। এভাবে কিছুদিন যাবার পর ছোট ছেলের বউ শাশুড়ীকে বলে, 'মা তোমার বিষয়-সম্পত্তি তোমার ছোট ছেলেকে লিখে দাও, আমরা তোমাকে বরাবর এভাবে দেখব'। ছেলে ও বউ-এর ব্যবহারে মা প্রীত হয়ে তার যাবতীয় সম্পত্তি ছোট ছেলেকে লিখে দেন। তার ধারণা যে, তিনি বেশি দিন বেঁচেও থাকবে না।

মানুষের চরিত্র বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। যাকে অতি সৎ লোক মনে করা হচ্ছে, সে-ই একদিন এমন এক অপকর্ম করে বসে, যার ফলে তার দীর্ঘদিনের সুনাম নিমেষে শেষ হয়ে যায়।

মা প্রতি রাতে চুড়িগুলি খুলে রেখে ঘুমান। সকালে আবার পরেন। একদিন তিনি চুড়ি পরতে ভুলে যান। যখন মনে পড়ে, তখন আর চুড়িগুলি পান না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মা চুড়িগুলি না পেয়ে কান্না শুরু করে দেন। মা বলেন, 'বউ ছাড়া এ ঘরে তো আমি আর কাউকে কখনও আসতে দেখিনি'। শাশুড়ীর কথায় বউ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বলে, আমিই কি তাহ'লে চুড়িগুলি চুরি করেছি। আমার কথায় স্বামী তোমাকে চুড়ি বানিয়ে দিয়েছে। আর এখন আমি চোর হ'লাম। মা বললেন, আমি তোমাকে চোর বলিনি। তুমি ছাড়া আমি তো আর কাউকে এ ঘরে আসতে দেখিনি। তুমি চুড়ি নাওনি, তবে চুড়িগুলি গেল কোথায়? ছেলে মা-বউ এর কথা কাটাকাটি থামাতে ব্যর্থ হ'ল। কথা কাটাকাটি চরমে উঠলে মা বললেন, তোমরা আমার বিষয়-আশয় হস্তগত করার কুমতলবে আমাকে আদর-যত্ন করেছ এবং চুড়িগুলিও বানিয়ে দিয়েছ।

তোমরা না সরালে চুড়িগুলি কি উড়ে গেল? আমার বিষয়-আশয় আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও থাকব না। মা বাড়ী হ'তে বের হয়ে গেলে বউ বলে, তোমার পরামর্শে চুড়িগুলি সরিয়ে আমি ভাল কাজ করিনি। ছেলে বলে, আস্তে বল, লোকে শুনতে পাবে।

মা বাড়ী থেকে বের হয়ে বড় ছেলের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন। বড় ছেলেকে অতি অনুনয়ের সুরে বলেন, 'বাবা! তুই আমার বড় ছেলে। তুই আমাকে একটু আশ্রয় দে বাবা। আমি ঘরের এক কোণে পড়ে থাকব। তোরা যা খাবার দিবি, তাই খাব। কোন আবদার ও অভিযোগ করব না'। ছেলে ও বউ একই সাথে বলে উঠল, 'তুমি বিষয়-আশয় সব ছোট ছেলেকে দিয়ে এখন আমাদের ঘাড়ে চাপতে চাও। তা হবে না। আমরা তোমাকে রাখতে পারব না।

ছেলে ও বউয়ের কাটা জবাব পেয়ে মা কাঁদতে কাঁদতে মেজ ছেলের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন। সেখানেও একই পরিস্থিতি। অগত্যা মা তার শেষ ভরসাস্থল মেয়ের বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য যান। সেখানেও তার ভাগ্যে জোটে একই বিড়ম্বনা। মেয়ে-জামাই ছোট ছেলেকে বিষয়-আশয় লিখে দেবার খবর জেনেছে। তাই তারা বলে উঠে, বিষয়-আশয় একজনকে দিয়ে আমাদের এখানে কেন এসেছ? আমরা তোমাকে রাখতে পারব না'।

মা কেঁদেকেটে পথে এসে দাঁড়ান। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে কিছুদিন কেটেও যায়। একদিন এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। এমন সময় এক পরিচিত কণ্ঠের চাচী ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে জেগে তিনি সামনে আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্বামীর বর্তমানে আব্দুল্লাহ তার বাড়ীর দীর্ঘদিনের কাজের ছেলে। সন্তানের স্নেহে মা তাকে নিজ সন্তানদের সাথে মানুষ করেছে। আব্দুল্লাহ বড় হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজ উপলক্ষ্যে সে বাইরে ছিল। তাই তার চাচীর বর্তমান হাল-চাল জানা ছিল না। আব্দুল্লাহ চাচীকে সান্ত্বনা দিয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং আদর-যত্নে রাখে। এভাবে কিছুদিন কেটে গেলে একদিন আব্দুল্লাহ শক্ত করে বাঁধা একটি পুঁটলি এনে চাচীকে দিয়ে বলে, এই পুঁটলির মধ্যে কিছু

গুপ্তধন রয়েছে। আপনি পুঁটলিটা কখনও খুলবেন না। মরার আগে এর সম্পদ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন’। আব্দুল্লাহ বুঝেছিল যে, গুপ্তধনের লোভে ছেলেরা মাকে ফিরিয়ে নিতে আসবে। তাই পুঁটলির ব্যাপারে সতর্ক করে দিল এবং তার কথামত অটল থাকতে বলল।

মায়ের হাতে গুপ্তধন আছে জেনে ছেলে-মেয়ে সবাই স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করল। অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে আগে মাকে আনবে, সেই গুপ্তধন পাবে। তাই সবাই সবার আগে মাকে আনতে গেল। ফলে একই দিনে এমনকি একই সময়েই সবাই মাকে আনতে হাযির হ’ল। সবাই জোর দাবী করল সে-ই মাকে নিয়ে যাবে। সবার দাবী দেখে মা বলল, ‘আমি কারো বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকব না। পালাক্রমে সকলের বাড়ীতে থাকব। আর মরার আগে আব্দুল্লাহ্‌র দেওয়া ধন সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিব।

মায়ের কথায় সবাই রাযী হয়ে মাকে নিয়ে এল। মা তখন খুবই আদর-যত্নে রইল। কিন্তু মৃত্যু কাউকেও অবকাশ দেয় না। মায়ের ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন সইল না। একদিন মা মৃত্যুবরণ করলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেরা যখন পুঁটলিটা খুলে সম্পদ ভাগ করে নিতে যাবে, ঠিক সে সময় আব্দুল্লাহ এসে হাযির। সে বলল, ঐ পুঁটলির মধ্যে কোনই ধন নেই। তোমরা সম্পদের লোভী বুঝে আমি এই বুদ্ধি খাঁটিয়েছি। তোমরা মায়ের প্রতি মোটেই দায়িত্ব পালন করনি। তোমাদের এ পাপের ক্ষমা হবে কি-না কে জানে?

ছেলেরা বুঝল, তারা সত্যিই মায়ের প্রতি গর্হিত আচরণ করেছে। তারা এও বুঝল যে, সম্পদের লোভে তারা তো মাকে ভালই যত্ন করেছে। এরূপ আচরণ করা তাদের পূর্বেই উচিত ছিল। মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য তারা অনুতপ্ত হ’ল এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে এর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইল।

শিক্ষা : পিতা-মাতাকে দেখাশুনা করা ও তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। পার্থিব কোন লোভের জন্য নয়; বরং জান্নাত লাভের আশায় তারা এ দায়িত্ব পালন করবে।

৬০. কৃপণ ও নিঃস্ব

অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে ছিল এক কৃপণ ব্যক্তি। তার ধন-সম্পদ ছিল অঢেল। হঠাৎ একদিন কোথাও যাওয়ার পথে তার একটা থলে হারিয়ে গেল। পথ চলার সময় এক নিঃস্ব ব্যক্তি থলেটি পেলেন। গরীব হ'লে কি হবে লোক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি থলের প্রকৃত মালিক ঐ কৃপণ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়ে তার টাকা তাকে ফেরত দিলেন। টাকা পেয়ে তো সে খুশীতে আটখানা। হঠাৎ তার মাথায় চিন্তা ঢুকল যে, লোকটি যে এত কষ্ট করে থলেটি আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাই তাকে অবশ্যই কিছু বখশীশ দিতে হবে। কিন্তু কৃপণতাহেতু বখশীশ না দেয়ার জন্য সে কূটবুদ্ধি আঁটল। নিঃস্ব লোকটিকে অপবাদের স্বরে বলল, 'থলেতে তো ২০২০ দিরহাম ছিল। আপনি তা থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন। তাই আর কোন বখশীশ দিতে পারছি না। আপনার জন্য ঐ ২০ দিরহামই যথেষ্ট'।

লোকটি তার এ কথায় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়ে কৃপণের বিরুদ্ধে কাযীর আদালতে মানহানির অভিযোগ ঠুকলেন। বিচারক কৃপণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার থলেতে কত টাকা ছিল? উত্তরে সে বলল, ২০২০ দিরহাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন কত আছে? সে বলল, ২০০০ দিরহাম, বাকী ২০ দিরহাম ঐ ব্যক্তি নিয়েছে। এবার বিচারক নিঃস্ব ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সত্যিই থলে থেকে ২০ দিরহাম নিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, এ ধরনের কোন ইচ্ছা যদি আমার থাকত, তাহ'লে পথে কুড়িয়ে পাওয়া থলেটি আমি তাকে কোন দুঃখে ফেরৎ দিলাম। সততার কারণেই অনেক খোঁজাখুঁজি করে থলের মালিককে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! থলে থেকে আমি এক দিরহামও নেইনি।

বিজ্ঞ বিচারক উভয়ের বক্তব্য শুনে দুষ্ট কৃপণ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যেহেতু বলছেন আপনার থলেতে ২০২০ দিরহাম ছিল, আর উনি থলেতে পেয়েছেন ২০০০ দিরহাম। কাজেই থলেটি আপনার নয়, অন্য কারো হয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি নিঃস্ব সৎ লোকটিকে বললেন, আপনি যদি এক

বছরের মধ্যে থলের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পান তাহ'লে তা তাকে ফেরত দিবেন। আর না পেলে আপনি নিজেই তা গ্রহণ করবেন।

কাযী ছাহেবের কথা শুনে কৃপণ তার মিথ্যা বলার দোষ স্বীকার করে পুনরায় থলে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালালো। কিন্তু বিচারক তার কোন কথাই আর শুনলেন না।

শিক্ষা : কৃপণতা মানুষের মন্দ স্বভাব। কৃপণতা সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়। তাই সর্বদা কৃপণতা বর্জন করা উচিত।

৬১. পান্থশালা

আল্লাহ পাক সময় সময় দুনিয়ার ধন-সম্পদে বিভোর মানুষকে ধন-সম্পদের মোহ হ'তে ফিরানোর জন্য কিছু অসীলা করে থাকেন। বলখী বাদশাহ ইবরাহীম বিন আদম প্রথম জীবনে আল্লাহওয়ালাই ছিলেন। কিন্তু পরে ধন-সম্পদের মোহে তিনি সে পথ হ'তে কিছুটা সরে যান। একদিন তাঁর রাজদরবারে এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। লোকটি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি এই পান্থশালায় রাত্রি যাপন করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিবাদ এল- 'আপনি সম্ভবতঃ ভুল করছেন, এটা রাজদরবার, পান্থশালা নয়'। আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, 'অবশ্যই এটা পান্থশালা'। এমন সময় বাদশাহ দরবারে এসে বিতর্ক শুনলেন। তিনি একটু ধমকের সুরে আগন্তুককে বললেন, 'এটা রাজদরবার, কস্মিনকালেও পান্থশালা নয়'।

আগন্তুক বললেন, 'আপনার আগে এখানে কে বাস করতেন'? উত্তর এল, 'আমার আব্বা'। আপনার পরে কে বাস করবে'? উত্তর এল, 'আমার ছেলে'?

এবার আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, 'তাহ'লে এখানে কেউই স্থায়ী হয়ে বাস করতে পারছেন না। আপনার আগে আপনার পিতা বাস করেছেন, এখন আপনি বাস করছেন, পরে আপনার ছেলে বাস করবে। অতএব এটা অবশ্যই পান্থশালা'। এবার বাদশাহ্র চৈতন্যোদয় হ'ল। তিনি বুঝলেন, সকলেই পান্থশালার বাসিন্দা। এরপর তিনি এক রাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অজানার পথে পা বাড়ালেন।

শিক্ষা : পার্থিব জগত ক্ষণিকের নীড়। কেউ এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না। একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে এ জগতের মায়া-মরীচিকা ছেড়ে না ফেরার দেশে। সুতরাং দুনিয়াবী শান-শওকত নিয়ে মদমত্ত থাকার কোন অর্থই হয় না। ক্ষণিকের এই সময়টুকু পরকালীন সঞ্চয়ে ব্যয় করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

৬২. খাদীজার পর্দা

খাদীজা অন্যান্য দিনের মত আজও খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে। ওযূ সেরে ফজরের ছালাত আদায় করে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করেছে। এরপর সে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। তখনও আকাশ পুরা ফর্সা হয়নি। চারিদিক থেকে পাখির কলরব ভেসে আসছে। সকালের শীতল হাওয়ায় খাদীজার মনের ব্যথা অনেকটা প্রশমিত হয়ে যায়। সে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাবে এই নোংরা পৃথিবীর কথা, যেখানে নিজের ভাল কাজ করার অধিকারটুকুও নেই। কী এমন অন্যায় সে করেছে, তা ভেবে পায় না। সেতো শুধু বোরক্বা পরে কলেজে যায়। প্রয়োজন ছাড়া কোন ছেলের সাথে কথা বলে না, ক্লাশ ছেড়ে কোথাও যায় না। আচ্ছা এগুলিই কি তার দোষ? তাহ'লে মালীহা, সুমাইয়া, আরীফা ওরা যেভাবে উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরা করে সেটাই কি ভাল? না, তা হবে কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, তাদের মালিকানাধীন বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম

হ'তে পার' *(নূর ৩১)*। আলোচ্য আয়াতে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তা মেনে চলা প্রত্যেক নারীর জন্য ফরয।

প্রতিদিনের মত গতকালও খাদীজা যথারীতি কলেজে গিয়েছিল। সে স্কুল জীবন থেকেই বোরক্বা পরত। মালীহা, সুমাইয়া, আরীফা সবাই খাদীজার খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। স্কুলজীবন থেকে ওরা খুব অন্তরঙ্গ। কলেজে উঠেও সেই অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান আছে। এদের মধ্যে একমাত্র খাদীজাই বোরক্বা পরে। অন্যদের মধ্যে মালীহা, আরীফা ততটা উচ্ছৃংখল নয়, যদিও বোরক্বা পরে না। কিন্তু সুমাইয়া খুব উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরা করে। ও প্রায় সময়ই বোরক্বা পরার জন্য খাদীজাকে তিরস্কার করে। কলেজে ওঠার পর বোরক্বা নিয়ে প্রায়ই খাদীজার সাথে তার কথা কাটাকাটি হ'ত। ওর এক কথা, বোরক্বা পরলে সামাজিক ও আধুনিক হওয়া যায় না।

টিফিন পিরিয়ডে সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লে সুমাইয়া খাদীজাকে বলল, চল, আর সঙ সেজে বসে না থেকে একটু বাইরে ঘুরে আসি। বোরক্বা নিয়ে বান্ধবীদের রসিকতা সে অনেক সহ্য করেছে। আজ আর পারল না। বলে উঠল, সঙ আমি সাজি, না তোরা? ঠোঁটে লিপস্টিক, কপালে টিপ আর ফিনফিনে জামা পরে তোরাই তো প্রতিদিন সঙ সেজে কলেজে আসিস। একথা শুনে অপমানে সুমাইয়ার চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। সে বলে, কী, এত বড় কথা! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। এই বলে টান দিয়ে খাদীজার মুখের নেকাব খুলে ফেলল সুমাইয়া। লজ্জায়, অপমানে খাদীজার চোখ-মুখও লাল হয়ে যায়। ও শুধু বলে, কাজটা ভাল করলি না সুমাইয়া। এরপর বাকী ক্লাশের সময় আর কারো সাথে কথা না বলে বেঞ্চে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে খাদীজা। অতঃপর কলেজ ছুটি হ'লে বাড়ী চলে আসে।

ঘটনাটি বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে খাদীজার। একবার মনে হচ্ছে সুমাইয়ার সাথে সে আর কোনদিন কথা বলবে না। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে তায়েফে সত্যের দাওয়াত দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফবাসীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অকল্যাণ কামনা না করে তিনি কল্যাণ কামনা করেছিলেন। এ কথা মনে করে খাদীজা ভাবে, হয়ত দোষ আমারই। সুমাইয়াকে ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। আজকে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কলেজের সময় হয়ে গেছে। ঝটপট তৈরী হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল খাদীজা। কিন্তু একি? আজ তার কোন বান্ধবীই কলেজে আসেনি। এমন তো কোন দিন হয় না। তাই ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল, কলেজ ছুটি হ'লে সুমাইয়াদের বাসায় যাবে। ওদের বাসায় পৌঁছে কলিংবেল টিপতেই ওদের কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিল। খাদীজা জিজ্ঞেস করল, সুমাইয়া আছে? মেয়েটি জবাব দিল, না। খাদীজা আবার বলল, তাহ'লে খালাম্মাকে ডেকে দাও। কাজের মেয়েটি তখন কেঁদে ফেলল। খাদীজা অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে খুলে বল। মেয়েটি যা বলল তাতে জানা গেল, গতকাল কলেজ থেকে ফেরার পথে একদল সন্ত্রাসী সুমাইয়ার মুখে এসিড নিক্ষেপ করেছে। সে এখন হাসপাতালে। একথা শুনে খাদীজা ভয়ে কেঁপে উঠল। পর্দাহীনতার পরিণামে যে কত রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—এ ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে রওয়ানা হয় খাদীজা। হাসপাতালে পৌঁছে নার্সের কাছ থেকে রুম নম্বর জেনে নিয়ে সেই রুমের দিকে এগিয়ে যায়। রুমের দরজা খুলেই চোখ পড়ে মালীহা, আরীফার দিকে। কাছে গিয়ে দেখে সুমাইয়ার মুখের এক পাশের বেশ কিছু অংশের চামড়া সম্পূর্ণ ঝলসে গেছে। খাদীজাকে দেখে সুমাইয়া কেঁদে ফেলে। খাদীজা সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না। সুমাইয়া খাদীজাকে বলে, আমি অন্যায় করেছি। সেরে উঠলে আমিও বোরক্বা পরেই কলেজে যাব। সাথে সাথে মালীহা আর আরীফাও বলে উঠল, শুধু তুই কেন, আমরাও যাব। আনন্দে খাদীজার চোখে পানি এসে যায়। বলে, তোদের নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আজ তা পূরণ হ'ল। অতঃপর খাদীজা ওদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! ওদের তুমি হেদায়াত দান কর! ওদের সকলের চোখে আনন্দের ঝিলিক, দুর্লভ কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দ আর বুকে একটি সোনালী সুন্দর সমাজ গঠনের দুর্বার আকাঙ্খা।

শিক্ষা : প্রত্যেক ঈমানদার নারীর উচিৎ হবে পর্দা সহকারে চলাফেরা করা এবং সেই সাথে পুরুষদের কাজ হবে মহিলাদেরকে পর্দা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও নিজেদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখা। ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ থেকে নারীকে বাঁচাতে হিজাব অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৬৩. পরিণামদর্শী ক্রীতদাস

জগতে যারা নিজেদের নাম অমর করে রেখেছেন, তারা কর্তব্যে অবহেলা করেননি। সময়ের কাজ সময়ে করেছেন। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখেননি।

এক সময় হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মত মানুষ কেনাবেচা হ'ত। এক লোক ছোট্ট একটি ছেলেকে কিনে নিয়ে যায়। ছেলেটি মালিকের অধীনে কাজ করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। একদিন মালিকের একমাত্র পুত্র পানিতে পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। ক্রীতদাস যুবকটি নিজের জীবন বাজি রেখে মনিবের ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে। মনিব ক্রীতদাসের এ কাজে খুশী হয়ে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন।

ক্রীতদাস তার নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অজানা। কে তার মাতা-পিতা? কোথায় তার বাড়ী? এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তাই সে মুক্তি পেয়ে নিজেকে বিব্রত মনে করল। তবুও সে সাগরের কিনারা ধরে যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর অগ্রসর হ'লে সমুদ্রগামী এক জাহাজ এসে তার সামনে ভিড়ল। জাহাজে কিছু লোকজন ছিল। তারা তাকে জোর করে জাহাজে উঠিয়ে গভীর সমুদ্রে জাহাজ চালনা করল। অতঃপর একটি জনবহুল দ্বীপে এসে জাহাজ ভিড়াল। সেখানে বহু লোকজন উপস্থিত ছিল। তারা যখন জানতে পারল একজনকে ধরে আনা হয়েছে, তখন তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। তারা উল্লাস করতে করতে ধৃত যুবককে শহরে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসাল। তারা বলতে লাগল, আজ থেকে আপনি আমাদের রাজা। আগামী পাঁচ বছর আপনি আমাদের রাজা থাকবেন। এ সময়ে আমরা আপনার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলব।

তাদের কথা শুনে ক্রীতদাস জিজ্ঞেস করল, পাঁচ বছর পর আমি কি করব? আমাকে তখন কি কাজে লাগানো হবে? জবাবে তারা বলল, পাঁচ বছর পর আপনাকে আবার জাহাজে উঠিয়ে একটি নির্জন দ্বীপে রেখে আসা হবে। আমাদের দেশের এটাই নিয়ম। যুবকটি বলল, অতীতে এভাবে কতজনকে রেখে আসা হয়েছে? জবাবে তারা বলল, বহুসংখ্যক লোককে। কিন্তু তারা কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখন মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তখন কেবল কেঁদেছে আর সময় বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমরা

আমাদের নিয়ম-নীতির কোন পরিবর্তন করি না। নিয়ম পরিবর্তন করা হ'লে নিয়মের গুরুত্ব থাকে না।

যুবকটি তাদের কথা শুনে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, শুরু থেকেই কাজ করতে হবে। তাই সে বলল, আমি যদি লোক পাঠিয়ে সে নির্জন দ্বীপ আবাদযোগ্য করে গড়ে তুলি, তাতে কি আপনারা সম্মত আছেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, অবশ্যই।

যুবকটি দেশ শাসন করার সাথে সাথে তাকে যে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হবে, সে দ্বীপটি রাজত্বের উপযোগী করে গড়ার কাজ শুরু করে দিল। সে পাঁচ বছর ধরে এ কাজ চালিয়ে গেল। অবশেষে যখন তার পাঁচ বছর রাজত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এল, তখন তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। কেননা নির্বাসিত দ্বীপে তাকে মেয়াদ মোতাবেক রাজত্ব করতে হবে না; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে সেখানে রাজত্ব করতে পারবে।

তাকে জাহাজে উঠিয়ে নির্বাসিত দ্বীপে রাখতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে এক বিরাট জনতা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ঘাটে সমবেত হয়েছে। সে জাহাজ হ'তে অবতরণ করলে জনতার হর্ষধ্বনিতে ঘাট মুখরিত হয়ে উঠল।

শিক্ষা : পরিণাম ভেবে কাজ করলে ফল ভাল পাওয়া যায়।

৬৪. মানুষকে সন্তুষ্ট করার পরিণতি

এক ব্যক্তি তার ঘোড়ায় চড়ে সফরে বের হয়েছে। সাথে স্ত্রী ও পুত্র হেঁটে যাচ্ছে। একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকেরা বলতে লাগল, দেখ কত বড় নিষ্ঠুর ব্যক্তি। স্ত্রী-সন্তানদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আরামে যাচ্ছে।

একথা শুনে লোকটি ভাবল, লোকেরা ঠিকই তো বলছে। এই ভেবে সে ঘোড়া থেকে নেমে গেল এবং ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে স্ত্রী সহ হেঁটে যেতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর ছেলেকে ঘোড়ার পিঠে দেখে লোকেরা বলল, দেখ, ছেলেটা কত বড় বেআদব! নিজে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর মাতা-পিতাকে হাঁটিয়ে নিচ্ছে।

লোকটি ভাবল, এরা তো ঠিকই বলেছে। সুতরাং এবার স্ত্রীকে ঘোড়ায় বসিয়ে বাপ-বেটা হেঁটে যেতে লাগল। অতঃপর আরেকটি গ্রাম অতিক্রমকালে লোকেরা বলতে লাগল, একেই বলে স্ত্রীশাসিত স্বামী। লোকটি ভাবল, এরাও তো ঠিকই বলছে। এই ভেবে সে স্ত্রী-পুত্র সবাইকে নিয়ে পুনরায় ঘোড়ায় চেপে বসল। অতঃপর অপর এক গ্রাম অতিক্রমকালে লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল, ঘোড়াটাকে একেবারে মেরে ফেলবে? একটা ঘোড়ায় এক সাথে কতজন মানুষ সওয়ার হয়েছে দেখ! লোকটি ভাবল, সবাই ঠিক বলছে। এবারে তারা সকলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগল। কিছু পথ অতিক্রমের পর লোকেরা বলতে লাগল, 'অকৃতজ্ঞ বান্দা একেই বলে। আল্লাহ্‌র নে'মতের কোন কদর নেই। নিজের যানবাহন আছে, অথচ সবাই হেঁটে মরছে। পালাক্রমে এক একজন করে চড়লেও তো পারে। সওয়ার হওয়ার যদি ইচ্ছা না থাকত তবে ঘোড়াটি সাথে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল। ঘরে বেঁধে রেখে আসলেই তো ভাল ছিল'।

লোকটি দেখল, ঘোড়ায় চড়ার কোন পদ্ধতিই আর বাকী নেই। সুতরাং এখন ঘোড়ায় না চড়ে এবং ঘোড়াকে শুধু হাঁটিয়ে না নিয়ে অন্য কোন পদ্ধতি আছে কি-না তাই করতে হবে।

লোকটি একটি বুদ্ধি আঁটল। একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে আসা হ'ল। বাঁশে ঘোড়ার চার পা বেঁধে ঘোড়াকে ঝুলিয়ে বাঁশের দুই দিক থেকে বাপ-বেটা ঘাড়ে করে চলতে লাগল। ঘোড়ার মাথা নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে। একটি নদী পার হওয়ার জন্য তারা যখন সাঁকো পার হচ্ছিল, তখন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাড়ার ছেলেরা সব 'হো হো' করে হাসতে লাগল এবং চিৎকার করে উঠল। তাদের চিৎকারে ঘোড়া ভয় পেয়ে এক ঝাঁকুনি মেরে ছিটকে নদীতে পড়ে গেল। ওদিকে বাঁশের বাড়ি খেয়ে দুই বাপ-বেটা উপুড় হয়ে পড়ে কারো মাথা কাটল, কারো থুতনি কেটে রক্ত বের হ'তে লাগল।

লোকটি দেখল, মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিপদ কত মারাত্মক। এত চেষ্টা করেও মানুষকে সন্তুষ্ট করা গেল না। অবশেষে ঘোড়াও হারাল, মাথাও কাটল। আমও গেল, ছালাও গেল।

শিক্ষা : আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সব কিছু করা অপরিহার্য। লোকে কি বলবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা সমীচীন নয়। কেননা একসাথে সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

৬৫. সাড়ে তিন হাত মাটি

সুদীর্ঘ পথেরও শেষ আছে, আছে এই মোহনীয় বসুন্ধরার। শুধু শেষ নেই বনু আদমের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া ও লোভ-লালসার। তারই আলোকে এই ছোট্ট গল্প।-

এক গ্রামে রিয়াযুদ্দীন নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে আরমান ওকালতি পাশ করে শহরেই থাকে। ছোট ছেলে আনোয়ার গ্রামে বাস করে। আনোয়ার পেশায় কৃষক। গ্রামের মাদরাসা থেকে সে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেছে। সে গভীর অনুরাগী। গ্রামেই সে বিয়ে করেছে। হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন রিয়াযুদ্দীন। বাবার দাফন-কাফন শেষে দু'ভাই একত্রে বসে আলোচনা করছে।

বড় ভাই বলছেন, শোন আনোয়ার, বাবা মৃত্যুর সময় সম্পত্তি আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। গ্রামের জমিজমা সব তোমার। আর শহরেরগুলি আমার। আর বাবা যেহেতু জমি বণ্টন করে দিয়েছেন, সেহেতু আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আরমান ছিল ছোটবেলা থেকেই লোভী প্রকৃতির। আর মিথ্যা বলায় পারঙ্গম। ছালাত-ছিয়াম সহ ধর্মীয় কার্যাদি পালনে ছিল তার চরম অনীহা। তবুও মাঝে-মধ্যে শুক্রবারে মসজিদে গেলেও বলত, এই দিনে সব লোক যায় তাই আমিও যাই। আরমানের গ্রামের বাড়ীতে জমি তেমন ছিল না। শহরেই সব। ব্যাংক ব্যালেন্স সহ বেশ কয়েকটি বাসা।

আরমান ছাহেবের দুই ছেলে হেলাল আর বেলালকে প্রয়োজনমত লেখাপড়া শিখিয়ে তার ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছেন।

আরমান ছাহেব বৃদ্ধ বয়সে উপনীত। আগেই সম্পত্তি দু'ছেলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। শরীরে তেমন জোর নেই বললেই চলে। সব সময় ঘরে তাসবীহ-তাহলীল করে সময় কাটান। মাঝে মাঝে ওয়ায-মাহফিলে যান এবং অনেক পাপ-পুণ্যের কথা শুনেন। মনে মনে ভাবেন কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইয়াতীমখানা, মাদরাসা, মসজিদ তৈরী করে দিবেন। কিন্তু আশা সেখানেই শেষ। অর্থ-সম্পদতো ছেলেদের হাতে।

আর ইদানীং ছেলেরা কাজে এতটা ব্যস্ত যে, পিতার খোঁজ-খবর নেয়ারও সময় নেই। আরমান ছাহেব শুধু অন্ধকার ঘরে বসে পাপ-পুণ্যের হিসাব কষেই সময় কাটান।

একদিন দুই ছেলের জোরালো কণ্ঠের আওয়ায পিতার কানে প্রবেশ করে। তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব পিতাকে নিয়েই। সারমর্ম হ'ল-

হেলাল বলছে, দেখ বেলাল। বাবার শরীর খারাপ। কখন মারা যায় বলা যায় না। কবর দেয়ার কথা তো ভাবতে হবে। উত্তরায় তোর যে খালি জায়গা পড়ে আছে, সেখানে দেওয়া যায় বলে ভাবছি। কথার মাঝে বাধা দিয়ে বেলাল বলে, না, এটা সম্ভব নয়। গতকাল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা হয়েছে, ওখানে একটা ফ্ল্যাট তুলব। বরং বিশ্বাসপাড়ায় তোর জায়গা আছে, সে জায়গায় দাফনের চিন্তা করা যায়। না না, ওখানে আমার ভিন্ন পরিকল্পনা আছে। দু'ভাইয়ের মাঝে তর্ক ঝগড়ায় রূপ নিল। পরিশেষে তারা বলল, আমাদের আর কি দোষ বল, বাবা যদি গ্রামের সব জমি চাচাকে লিখে না দিত, তবে সেখানে বাবার কবরের ব্যবস্থা করা যেত।

আরমান ছাহেব ছেলেদের কথা শুনছেন আর নীরবে চোখের পানি ফেলছেন। জীবনের এতটা বছর অতিক্রম করেছেন লোভ-লালসা আর অর্থের মোহে। কখনও পরকালের কথা ভাবেননি। অথচ ছোট ভাইকে ঠকিয়ে এত সম্পদ দখল করার পরও সাড়ে তিন হাত জায়গা তার ভাগ্যে জুটছে না। হায়রে নিয়তি, হায়রে জীবন, হায়রে সাড়ে তিন হাত জমি। আজ সবাই আমার পর।

শিক্ষা : অন্যকে ঠকানোর পরিণতি কখনো ভাল হয় না।

৬৬. কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতা

কচ্ছপ ও খরগোশ একবার পাহাড়কে সীমানা নির্ধারণ করে দৌড় প্রতিযোগিতা করল। খরগোশ তার দ্রুতগামিতার কারণে রাস্তায় অলসতা করল ও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কচ্ছপ তার মন্থরগতির কারণে রাস্তায় বিশ্রাম না নিয়ে অবিরাম চলতে থাকল। ফলে যথাসময়ে সে গন্তব্যে পৌঁছে গেল। যখন খরগোশ ঘুম থেকে জাগ্রত হ'ল তখন কচ্ছপকে বিজয়ী অবস্থায় দেখতে পেল। অতঃপর সে লজ্জিত হ'ল। কিন্তু তার লজ্জা তাকে কোন ফায়দা দিল না।

শিক্ষা : ছোট বলে কাউকে অবহেলা-অবজ্ঞা করতে নেই।

৬৭. তিন বোকার কাণ্ড

একবার তিন বোকা ব্যক্তি একটি মিনারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন বলল, অতীত কালের রাজমিস্ত্রীরা কতইনা লম্বা ছিল! এমনকি এ মিনারের মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দ্বিতীয়জন বলল, বেকুব কোথাকার। তুমি যা ভাবছ তা নয়। রাজমিস্ত্রীরা ভূপৃষ্ঠে একে তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে মূর্খের দল! এটি একটি কূপ ছিল। অতঃপর তা মিনারে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিক্ষা : মূর্খ ও জ্ঞানী কখনো সমান নয়।

৬৮. জীবিকা অর্জনের চেষ্টা

কোনো এক জঙ্গলে এক দরবেশ বাস করতো। একদিন একটি কাককে গাছের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে দেখে তার মনে কৌতূহল জাগল, কাক ওখানে কেন যাওয়া-আসা করে। হঠাৎ দেখলেন একটি অন্ধ সাপকে কাক আহার করাচ্ছে। দরবেশ এ ঘটনায় আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের কথা বুঝতে পেরে মনে মনে ভাবলেন, আল্লাহ পাক যখন একটি প্রাণীর রূযী-রোযগারের ব্যবস্থা বিনা পরিশ্রমে করে দিচ্ছেন, তখন খাবারের জন্য এত চিন্তা করে মাথা

খারাপ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? আমার খাবারও ঠিক সময়ে এসে যাবে। এই ভেবে তিনি আস্তানায় ফিরে এসে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে গেলেন। তিন দিন তিন রাত চলে গেলো, কিন্তু খাবারের কোনো ব্যবস্থা হ'ল না। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিছুই পাঠালেন না। অবশেষে তখনকার নবীকে আল্লাহ তা'আলা দরবেশের কাছে পাঠালেন। নবী এসে দরবেশকে বললেন, তোমার শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে। তুমি কেন নিজেকে দুর্বল অন্ধ সাপের সাথে তুলনা করতে গেলে। তোমার উচিত অন্যের বোঝা না হয়ে, অন্যের উপকার করা। দরবেশ তার ভুল বুঝতে পারল এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইল।

শিক্ষা : রূযীদাতা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। ঘরে বসে থাকলে চলবে না।

৬৯. চাষী ও ইঁদুর

এক চাষী ভবিষ্যতের জন্য কিছু ধান জমা করে রেখেছিল। তার ঘরের পাশে একটি ইঁদুর বাস করতো। সে দেয়াল ছিদ্র করে ধান সরাতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক ধান নিয়ে গেল। যখন আশপাশের ইঁদুরগুলো দেখল যে, অমুক ইঁদুরের অবস্থা খুব ভালো হয়ে গেছে। তখন তার কাছে সব ইঁদুর জমা হ'তে লাগল। দিন-রাত তোষামোদ ও নানা রং-বেরংয়ের কথা বলে তার মেযাজ বিগড়ে দিল। ইঁদুরও অহংকারে মাটিতে পা ফেলত না। গর্বে চারদিকে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। চাষী ধানের ঘরে ইঁদুরের আনাগোনা ও লাফালাফি দেখতে পেয়ে সমস্ত ধান অন্যত্র সরিয়ে নিল। ওদিকে অল্পদিনেই ইঁদুরের ধান শেষ হয়ে গেল। যেসব ইঁদুর তার সাথে সাথে চলাফেরা করতো, তারাও নিজ নিজ পথ দেখল। ইঁদুর আর কি করবে, একদিন মনের দুঃখে দেয়ালে মাথা ঠুকে মারা গেল।

শিক্ষা : আয় বুঝে ব্যয় করাই মানুষের কর্তব্য। যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে, তার পরিণাম ঐ ইঁদুরের মতোই মন্দ হয়।

৭০. বানর ও কাঠমিস্ত্রী

কোনো এক জঙ্গলের ধারে এক কাঠমিস্ত্রী করাত দিয়ে গাছ ফাঁড়ছিল এবং দু'টি তক্তার মাঝখানে খিল মেরে রেখেছিল। অন্য এক গাছ থেকে একটি বানর তার করাত চালনা ও খিল মারা দেখছিল। বানরের মনে এসব দেখে ইচ্ছা হ'ল, সেও গাছ ফাঁড়বে। কাঠমিস্ত্রী খাওয়ার জন্য চলে গেলে বানর এসে গাছটির উপর এমনভাবে বসল যে, তার লেজটি তক্তার ফাঁক দিয়ে নীচে ঝুলে পড়ল। বানর করাতের কাছে ঘেঁষে যেমনি তক্তার খিল ধরে টান দিল, অমনি খিল খুলে গিয়ে দু'টি তক্তা পরস্পর মিলে গেল। আর বানরের লেজ তক্তার ফাঁকে আটকা পড়ল। তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে চিৎকার করে বলছিল, আমার কাজ ছিল গাছে গাছে ফলমূল খেয়ে বেড়ানো। আমি কেন করাত চালাতে আসলাম। ইতিমধ্যে কাঠমিস্ত্রী এসে উপস্থিত হ'ল এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বানরের বাঁদরামি শেষ করে দিল।

শিক্ষা : যার কাজ তার সাজে, অন্যের নয়।

৭১. খরগোশ ও শিয়াল

এক নেকড়ে বাঘ একটি ঘুমন্ত খরগোশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেচারা নিদ্রা থেকে জেগে দেখল, সে মৃত্যুর কবলে। তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। সে তখন অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগল, আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার মতো এত দুর্বল প্রাণী জাঁহাপনার ক্ষুধা মেটাতে পারবে না। যদি জাঁহাপনা এই এক লোকমার আশা ত্যাগ করেন, তাহলে এক শিয়ালকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি, যা শিকার করলে জাঁহাপনার তৃপ্তি হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বান্দাতো জাঁহাপনার খেদমতে হাযির আছেই।

কথাটা নেকড়ে বাঘের মনঃপূত হ'ল। সে খরগোশের সাথে রওয়ানা হ'ল। কাছেই শিয়ালের একটি গর্ত ছিল। খরগোশের সঙ্গে তার অনেক দিনের শত্রুতা। খরগোশ গর্তের কাছে গিয়ে বলল, জনাবের নির্জন বাস ও ধার্মিকতার খ্যাতি শুনে একজন জ্ঞানী সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। যদি অবসর

থাকে, তাহ'লে এখনি সাক্ষাতের সুযোগ দিন; নতুবা আপনার সুবিধা মতো খেদমতে হাযির হবেন।

শিয়াল ওর মিষ্টি কথায় প্রতারণার আভাস পেয়ে উল্টো ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলল, সৌভাগ্য যে, এমন বুযুর্গব্যক্তি আমার মতো নাচীযের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বিলম্ব করতে হবে। কারণ আমি ঘরটিকে ঝেড়ে-মুছে জনাবের বসার উপযুক্ত না করে বাইরে আসতে পারছি না। খরগোশ নেকড়ে বাঘকে এ সংবাদ জানাল এবং সে একথা শুনে খুব খুশি হ'ল। শিয়াল পূর্ব থেকে গর্তে ঢোকার রাস্তায় একটি গভীর কূপ খনন করে রেখেছিল। তাই নতুন করে লতা-পাতা দিয়ে ঐ গর্তটি ঢেকে দিল। খরগোশ নেকড়ে বাঘকে নিয়ে সেই অন্ধকার গর্তে ঢুকতে গেল এবং দিশা না পেয়ে সেই গভীর কূপে পড়ে গেল। নেকড়ে বাঘ এ ঘটনাকে খরগোশের চালাকি মনে করে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলল।

শিক্ষা : বুদ্ধিমানকে কখনো ধোঁকা দেয়া যায় না।

৭২. মাছের বুদ্ধিমত্তা

কোনো এক জলাশয়ে তিনটি মাছ বাস করতো। তাদের মধ্যে একজন অতীব বুদ্ধিমান, একজন মাঝারি মানের বুদ্ধিমান এবং একজন নির্বোধ। একদিন সেখানে কয়েকজন জেলে এসে পরামর্শ করল, জাল এনে কিভাবে সেখান থেকে মাছ ধরে নেওয়া যায়। জেলেদের কথা শুনে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মাছটি তৎক্ষণাৎ নালা দিয়ে অন্য জলাশয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে জেলেরা জাল এনে চারিদিক বন্ধ করে দিলো। দ্বিতীয় মাছটি যখন দেখল যে, সে আটকা পড়ে গেছে তখন তার অর্ধেক বুদ্ধির জোরে নিজেকে মরার মতো করে পানির উপর ভাসিয়ে দিলো। জেলেরা ওকে মরা মনে করে জালের বাইরে ফেলে দিল। ফলে সেও বেঁচে গেল। আর তৃতীয় নির্বোধ মাছটি ওদের জালে আটকা পড়ল।

শিক্ষা : বিপদে পড়েও যে নিজেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন করে না, সে মূর্খ।

৭৩. কচ্ছপ ও হাঁস

এক পুকুরে দু'টি হাঁস এবং একটি কচ্ছপ বাস করতো। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পুকুরের পানি শুকিয়ে গেলে হাঁস দু'টি কচ্ছপকে বলল, বন্ধু! এখানে আর আমাদের থাকা সম্ভব নয়। কাজেই এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে।

কচ্ছপ বলল, তা কি করে হয়? তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে আমি একা এখানে থাকব কিভাবে? তোমাদের বিরহ-বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমিও ভাবছি, পুকুরের পানি একেবারে শুকিয়ে গেলে আমি তোমাদের সাথে চলে যাব। হাঁস দু'টি বলল, কিন্তু আমাদের সাথে তুমি যাবে কি করে? কারণ আমরা উড়তে পারি, তুমি তো আকাশে উড়তে পারো না?

কচ্ছপ বলল, এর উপায়ও তোমরাই চিন্তা করো। হাঁস দু'টি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত হ'ল সর্বদা আমাদের কথা মেনে চলতে হবে। আমরা তোমাকে নিয়ে যখন উড়াল দিব, তখন তা দেখে নিচের লোকেরা চেঁচামেচি করবে, কিন্তু সাবধান! তুমি টুঁ শব্দটিও করতে পারবে না। কচ্ছপ এ শর্ত মেনে নিল। হাঁস দু'টি বুদ্ধি করে একটি কাঠি এনে কচ্ছপের মুখে দিয়ে বলল, একে শক্ত করে কামড় দিয়ে ধরে রাখবে। এ বলে দু'দিক থেকে দুই হাঁস কাঠিটি ঠোঁটে চেপে ধরে আকাশে উড়ল। যাওয়ার পথে ওরা এক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা এভাবে তাদেরকে উড়তে দেখে চিৎকার করে বলতে শুরু করল, আরে কি মজার ব্যাপার, দেখো দু'টি হাঁস একটি কচ্ছপকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কচ্ছপ অনেকক্ষণ চুপ করেই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে বলতে চাইল যে, তাতে তোদের কি? কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখ থেকে কাঠি ছুটে গেল, আর সে মাটিতে পড়ে পটল তুলল। হাঁস দু'টি চিৎকার করে বলল, বন্ধুর কাজ হ'ল উপদেশ দেয়া আর যারা সৌভাগ্যবান, তারাই শুধু সে উপদেশ থেকে লাভবান হয়।

শিক্ষা : যারা হিতাকাঙ্খী বন্ধুর কথা শোনে না তারা বিপদে পড়ে।

৭৪. বাদশাহ ও তার চামচা

এক বাদশাহ সর্বদা নীচুমনা ও ভীরুদের সাথে বসবাস করতো। তারাও তার চামচামি করে সব সময় তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করত। ওদের মধ্যে আবীর নামে একজন একেবারে বাদশার মাথায় চড়ে বসেছিল। একদিন বাদশাহ নির্জনে ওকে বলল, আমি তোর কাছে একটি গোপন কথা বলছি, কিন্তু সাবধান! কেউ যেন জানতে না পারে। আবীর গোপন কথা না বলার জন্য হাযার রকমের কিরা-কসম কাটল। বাদশাহ খুশী হয়ে বলল, আমার ভাই আমাকে হত্যা করবে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুই সর্বদা আমার দিকে লক্ষ্য রাখবি, যেন ভাই কিছু করার আগেই আমি ওকে শেষ করে দিতে পারি।

খারাপ লোকের পেটে গোপন কথা হজম হয় না। আবীর সুযোগ পেয়েই সব কথা বাদশাহ্‌র ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করে দিল। এজন্য সে তার বিনিময়ে আবীরকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করল। ফলে সে কৌশলে বাদশার নিকট থেকে দূরে সরে থাকল এবং গোপনে তাকে শেষ করার উপায় খুঁজতে লাগল। বাদশার ভাগ্য ছিল মন্দ, তাই ভায়ের হাতেই সে খুন হ'ল। ভাই সিংহাসনে বসে প্রথমেই বিশ্বাসঘাতক আবীরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। সে কেঁদে গড়াগড়ি খেয়ে বলল, আমার সদ্ব্যবহারের প্রতিদান বুঝি এই শাস্তি? বাদশাহ বলল, গোপন কথা প্রকাশ করা হ'ল সবচেয়ে বড় অপরাধ। আমার ভাই তোকে এতো বিশ্বাস করত, আর তার কথাই যখন তুই হজম করতে পারলি না, তখন আমি কোন বিশ্বাসে তোকে জীবিত রাখতে পারি? অবশেষে বাদশাহর আদেশে তাকে ফাঁসি দেয়া হ'ল।

শিক্ষা : কারো গোপন কথা প্রকাশ করা চরম অন্যায়। এর পরিণামও ভয়াবহ।

৭৫. মূর্খ চিকিৎসক

জনৈক মূর্খ চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা করে মৃত্যুর বাজার গরম করে ফেলেছিল। এ সত্ত্বেও সে নিজেকে ইবনে সীনা, লোকমান হেকিম ও প্লেটো মনে করতো। আর ঐ শহরেই একজন অভিজ্ঞ নামকরা হেকিম ছিলেন। বয়সের দরুন তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সে দেশের বাদশাহ্‌র ছেলে খুব কঠিন রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বাদশাহ সেই নামকরা

অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দরবারে ডাকালেন। সে রোগীর অবস্থা শুনে বলল, এর একমাত্র ঔষধ 'মুহরান চূর্ণ'। অর্থাৎ কিছু চিনি ও দারুচিনি একসাথে মিশ্রণ করে সেবন করাতে হবে। মুহরান চূর্ণটি আমি বাদশাহী দাওয়াখানায় একটি তালাবদ্ধ রৌপ্যের কৌটায় সংরক্ষিত দেখেছি। আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না, তা না হ'লে ঠিকঠাক বের করে আনতে পারতাম। সেই মহামূর্খ হেকিম যে সকল মূর্খের উপর মাতব্বরী করতো, বাদশাহ্‌র লোকজন তার নিকট গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করল। সব শুনে সে বলল, হতে পারে অন্ধ হেকিম কোন ফাঁকে আমার নিকট থেকে এ নিয়মটি শুনে নিয়েছে। কারণ এ ঔষধ তৈরির নিয়ম-কানুন আমি খুব ভাল করেই জানি। তার এ ধরনের কথাবার্তার খবর বাদশাহ্‌র কানেও পৌঁছল। তিনি এসব শুনে খুব খুশি হয়ে তাকে বাদশাহী দাওয়াখানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে একই ধরনের অসংখ্য কৌটা দেখতে পেয়ে তার মাথা বিগড়ে গেল। আসলে সে তো মহামূর্খ, তাই কিছু বুঝতে না পেরে নিজের বড়ত্ব যাহির করার জন্য আন্দাজে একটা কৌটা হাতে তুলে নিল। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সে কৌটায় ছিল মারাত্মক বিষ। সে তাড়াতাড়ি তা খুলে চিনি আর দারুচিনি মিশিয়ে শাহজাদাকে সেবন করিয়ে দিল। সেবন করা মাত্রই শাহজাদা মারা গেল। বাদশাহ এ দুর্ঘটনায় খুবই মর্মাহত হলেন এবং অবশিষ্ট ঔষধ পরীক্ষামূলকভাবে মহামূর্খ হেকিমকে সেবন করিয়ে দিলেন। সে খেতে না খেতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

শিক্ষা : না জেনে কাজ করার পরিণতি খুবই মন্দ হয়।

৭৬. লোভী শিকারী ও বাঘ

এক শিকারীর পেতে রাখা জালে এক হরিণ আটকা পড়ল। শিকারী তাকে ধরতে গেলে সে সজোরে এমনভাবে লাফ দিল যে জাল ছিঁড়ে গেল। ফলে হরিণ বেরিয়ে পড়ল। শিকারী তাকে তীর মেরে মাটিতে ফেলে দিল এবং দড়িতে বেঁধে বাড়ির পথ ধরল। রাস্তায় দেখল একটা দেঁতো যাচ্ছে। সে লোভ সামলাতে না পেরে ওর দিকেও একটি তীর ছুঁড়ল। দেঁতো তাতে যখম হয়েও শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পেট ফেঁড়ে ফেলল। শিকারী মরল আর তীরের আঘাতে দেঁতোও পটল তুললো। এমন সময়ে সেখানে এক বাঘ এসে উপস্থিত। তিনটি শিকার মরা অবস্থায় পেয়ে সে তো খুশিতে বাগবাগ। ভাবল,

এমন অযাচিত আহার্য খুব কমই পাওয়া যায়। রেখে থুয়ে খাওয়া উচিত। আজ ধনুকের ছিলা খেয়েই কাজ চালিয়ে দেব। বাকিগুলো ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে। এই ভেবে সে ধনুকের ছিলা খাওয়ার জন্য কামড়াতে আরম্ভ করল। অতি কষ্টে ছিলা তো ছিঁড়ল, ওদিকে তড়াক করে ধনুকের এক মাথা গিয়ে ঢুকল ওর মগজে। আর তাতেই বাঘের দফা রফা হয়ে গেল।

শিক্ষা : সবসময় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের নেশা ভাল নয়।

৭৭. লোভী বিড়াল

কোন এক ব্যক্তি একটি বিড়াল পুষেছিল। সে প্রয়োজনমতো তাকে অল্প অল্প করে আহার দিতো। কিন্তু তাতে বিড়ালের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হত না। একদিন সে অন্য বাড়ির কবুতরের খাঁচার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। খাঁচার ভেতরে ওদের শব্দ শুনে লোভে তার জিহ্বা দিয়ে পানি গড়াতে আরম্ভ করল। লোভ সামলাতে না পেরে শেষবধি সে খাঁচায় ঢুকে পড়ল। খাঁচার পাহারাদার তা দেখতে পেয়ে বিড়ালকে এমন পিটুনি দিল যে, বেচারা হজম করতে না পেরে মরে গেল। পাহারাদার বিড়ালের চামড়া খসিয়ে তাতে ভুষি ভরে কবুতরের খাঁচার সম্মুখে টাঙ্গিয়ে রাখল। বিড়ালপালক একদিন সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তার বিড়ালের এই দুর্দশা দেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আহা বেচারা! যদি তুই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতিস, তাহলে এভাবে তোর চামড়া তুলে নেওয়া হত না।

শিক্ষা : অল্পে তুষ্ট না থাকলে ঐ লোভী বিড়ালের মতো অবস্থা হবে।

৭৮. বিপদগ্রস্তকে সর্বাগ্রে সাহায্য করা

একটি ছেলে নদীতে মনের আনন্দে গোসল করছিল। হঠাৎ সে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। তীরে একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে লাগল। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে না গিয়ে উল্টো এই বলে ধমকাতে লাগলো যে, সাঁতার না জেনে একা একা নদীতে কেন নামতে গেলে? এভাবে কেউ নামে? উযবুক কোথাকার! ছেলেটি বলল, আগে আমাকে উদ্ধার কর। তারপর উপদেশ দিও।

শিক্ষা : বিপদগ্রস্তকে আগে সাহায্য করতে হবে। তারপর প্রয়োজনে উপদেশ দিতে হবে।

৭৯. সময়ের কাজ সময়ে করা

এক দেশে ছিল এক গরীব কৃষক। তার অল্প কিছু জমি ছিল। সে জমিতে কিছু পেয়ারা গাছ লাগাল। তার নিবিড় পরিচর্যায় গাছগুলি অনেক বড় ও সুন্দর হয়ে উঠল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ধরল প্রচুর পেয়ারা। সে নিজে খাওয়ার পরেও একদিন কিছু পেয়ারা গাছ থেকে নামিয়ে বাড়ির কাছে ছোট্ট বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেল। পেয়ারা কেনার জন্য অনেক ক্রেতা আসল। ক্রেতাদের মধ্যে একজনের পেয়ারা কেনার টাকা ছিল না। কিন্তু তরতাজা পেয়ারা খাওয়ার জন্য তার খুব লোভ হ'ল। কি করে পেয়ারা খাওয়া যায়, সেজন্য সে ঐ কৃষকের সাথে আলাপ শুরু করল। সে বলল, বাহ! বেশ সুন্দর তরতাজা পেয়ারা যে! এর পিছনে আপনার অনেক শ্রম আছে নিশ্চয়ই। অন্যথা এত সুন্দর নিখুঁত ফল হ'তে পারে না। দেখতে যত সুন্দর খেতে তদ্রূপ মিষ্টি ও সুস্বাদু হবে নিশ্চয়ই! এসব শুনে কৃষক লোকটিকে পেয়ারা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু ক্রেতা পেয়ারা খেল না। অবশেষে কৃষক ঐ ব্যক্তিকে এক কেজি পেয়ারা বাকিতে দিতে চাইল। ক্রেতা প্রথমে নিতে রাযী না হ'লেও কৃষকের কথায় পরে রাযী হ'ল। ক্রেতা পুনরায় বলল, পেয়ারা খেতে ভাল হবে তো? কৃষক তখন ঝুড়ি থেকে আরো একটা পেয়ারা ক্রেতার হাতে দিয়ে বলল, খেয়ে দেখুন, এটার পয়সা লাগবে না। ভাল হ'লে নিবেন, আর ভাল না হ'লে নিতে হবে না। তখন ক্রেতা বলল, এখন খাওয়া যাবে না, আমি ছিয়াম আছি। কৃষক বলল, রামাযানের তো মাত্র দু'দিন বাকী, এই অসময়ে কিসের ছিয়াম? ক্রেতা বলল, গত রামাযান মাসের কাযা ছিয়াম আদায় করছি। কৃষক রেগে পেয়ারার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে বলল, যে আল্লাহ্‌র ঋণ পরিশোধ করতে এত দেরী করে, সে মানুষের ঋণ সময় মত পরিশোধ করবে কি করে?

শিক্ষা : সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়, না হ'লে ঠকতে হয়।

৮০. কুরআন-হাদীছের বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয়

জনৈক ব্যক্তির চোখের সমস্যা ছিল। সে একদিন ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার একটা টেস্ট করার জন্য লিখে দিয়ে বললেন, টেস্টটি করে রিপোর্ট নিয়ে আগামীকাল দেখা করবেন। পরের দিন রিপোর্ট দেখে ডাক্তার একটা

চশমা ও কিছু ঔষধ লিখে দিলেন। লোকটি চশমার দোকানে গিয়ে চশমার দাম ঠিক করল। দোকানদার বলল, চশমার ফ্রেমের দাম ২৫০ টাকা ও পাওয়ার গ্লাসের দাম ২৫০ টাকা মোট ৫০০ টাকা লাগবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ৫০০ পাওয়ারের গ্লাসের দাম কত? দোকানদার বলল, ২৫০ টাকা। লোকটি বলল, ২৫০ পাওয়ার ও ৫০০ পাওয়ারের কাঁচের একই দাম? দোকানদার বলল, হ্যাঁ। তখন লোকটি ৫০০ পাওয়ারের চশমাটি নিলো। পরের দিন বাজারে গিয়ে সে বড় বড় কৈ মাছ দেখে তা কিনে নিয়ে বাড়ি আসল। স্ত্রীকে বলল, কৈ মাছ সুন্দর করে রান্না করবে। কৈ মাছ রান্না করে স্ত্রী তার প্লেটে দিল। লোকটি বলল, কৈ মাছের মাথা কোথায় গেল? স্ত্রী বলল, মাছতো খুব ছোট ছোট, তার মাথা রাখা গেল না। তখন লোকটি স্ত্রীকে মারধর করল।

এরপর সে মাছওয়ালার কাছে এসে বলল, তোমার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে মেরেছি। মাছওয়ালা বলল, কেন? লোকটি বলল, আমি বড় বড় দেখে কৈ মাছ কিনে নিয়ে গেলাম, অথচ বাড়ি গিয়ে দেখি তা খুবই ছোট। মাছওয়ালা বলল, আপনার চোখে সমস্যা আছে। আমি তো ছোট কৈ মাছই বিক্রি করছি। লোকটি বলল, চোখে সমস্যার কারণেই তো চশমা নিয়েছি। তখন মাছওয়ালা বলল, তাহ'লে আপনার চশমায় সমস্যা। লোকটি বলল, চশমায় সমস্যা নেই, কারণ আমি ৫০০ পাওয়ারের চশমা নিয়েছি। তুমিই আমাকে ঠকিয়েছ।

এরপর সে বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলল, তোমার বাপের বাড়ীতে যাবে? স্ত্রী বলল, চল যাই। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। স্ত্রীকে বলল, তুমি হাঁটতে থাক, আমি আসছি। কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। স্ত্রী হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পোঁছে গেল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পথে ছিল একটা খাল। চশমাতে দেখা যাচ্ছে খুব ছোট। সে লাফ দিয়ে পার হ'তে গিয়ে খালের মধ্যে পড়ে গেল। খরস্রোতা খালে পড়ে তার অবস্থা কাহিল। কারণ সে সাঁতার জানে না। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে গেছে। কোনমতে ভেসে ভেসে কূলে আসল। বাড়ীতে পোঁছলে স্ত্রী বলল, তোমার এমন দশা হ'ল কি করে? তোমার সারা শরীর ভেজা কেন? লোকটি বলল, খালে পড়ে গিয়েছিলাম। স্ত্রী বলল, তুমি কি চোখে দেখতে পাওনি? লোকটি বলল, চশমাতে দেখলাম, ছোট খাল। তাই লাফিয়ে পার হ'তে গিয়ে খালেই পড়ে গেলাম। স্ত্রী বলল, ডাক্তারের কাছে গিয়ে চশমার

পাওয়ার ঠিক করে আন। লোকটি পরের দিন ডাক্তারের কাছে গিয়ে দু'টি ঘটনাই বলল। ডাক্তার চশমা পরীক্ষা করে পাওয়ার দেখে বললেন, আমিতো আপনাকে ২৫০ পাওয়ারের চশমা দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ৫০০ পাওয়ারের চশমা কেন কিনেছেন? ডাক্তারের পরামর্শ মত চশমা না নেওয়ায় এই পরিণতি। যান চশমার পাওয়ার ঠিক করে নিন।

শিক্ষা : মুমিনকেও কেবল কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। কুরআন ও হাদীছের বিধান কস্মিনকালেও পরিবর্তনযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে দেখিয়ে গেছেন ঠিক সেভাবে আমল করতে হবে। ইচ্ছামত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নাই। অন্যথা সামাজিকভাবে যেমন বিপর্যস্ত হতে হবে, তেমনি পরকালে অবস্থা হবে বেগতিক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

৮১. ঈমান হরণ

অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে লাবীব। বছর পনের হ'ল গ্রামের মায়া-মমতা ত্যাগ করে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য তার বাইরে যাওয়া। গ্রামে কোন ভাল আলেম ছিল না, যার কাছ থেকে গ্রামবাসী দ্বীনী ইলম শিক্ষা করবে। এতদিন পরে লাবীব যোগ্য আলেম হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এসেছে। গ্রামের লোকেরা এতে দারুণ খুশি।

আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারী, শহীদ দিবস। এটা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে। তাই বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা ফুল সংগ্রহে মেতে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার ফুল সংগ্রহ করে তারা পুষ্পাঞ্জলি তৈরী করছে। লাবীব এ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল এবং মনে মনে ভাবল, আমিও এক সময় এমনটিই করতাম। এটা ভেবেই সে খুব মানসিক কষ্ট অনুভব করল। অতঃপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, হায়! এভাবেই রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ঈমান হরণ করছেন। এরপর সে ঐ ছেলে-মেয়েদের নিকটে আসল এবং তাদেরকে ২১শে

ফেব্রুয়ারীর করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বুঝাল। হাসান নামের একটি ছেলে ব্যতীত সবাই তার কথাকে উপেক্ষা করে চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলা হাসান সিদ্ধান্ত নিল যে, সে ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন অনুষ্ঠানে যাবে না। কিন্তু বন্ধুদের চাপের মুখে অবশেষে তাকে যেতেই হ'ল। ছাত্র-ছাত্রীরা নগ্নপায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করল। তাদের পিছু পিছু হাসান জুতা পরে খালি হাতে নীরবে শহীদ মিনারে গেল। একজন শিক্ষক তাকে জুতা পরে শহীদ মিনারে আসতে দেখে দ্রুত তার কাছে এলেন। হাসানের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে শহীদ মিনার থেকে নামালেন এবং একজন ছাত্রকে একটি লাঠি আনার হুকুম দিলেন। এরপর তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই বেদম প্রহার করলেন। আর বেয়াদব, অসভ্য, মূর্খ ইত্যাদি বলে গালি-গালাজ করলেন। শিক্ষকের বেধড়ক লাঠির আঘাতে হাসান অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বন্ধুরা ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। বাবা-মা ছেলের এ অবস্থা দেখে অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে হাসানের বাবা তাকে নিয়ে লাবীবের নিকটে আসলেন এবং তাকে সবকিছু খুলে বললেন। গ্রামের কতিপয় গণ্যমান্য লোককে সাথে নিয়ে লাবীব ও হাসানের বাবা পরদিন স্কুলে গেলেন। যে শিক্ষক হাসানকে মেরেছিল লাবীব ঐ শিক্ষককে মারার কারণ জিজ্ঞেস করল। শিক্ষক বললেন, হাসান জুতা পরে শহীদ মিনারে গিয়ে শহীদদের অপমান করেছে, এটিই তার অপরাধ। লাবীব বলল, বলুনতো পৃথিবীতে উত্তম জায়গা কোনটি, মসজিদ নাকি শহীদ মিনার? তিনি বললেন, মসজিদ। লাবীব বলল, মসজিদ উত্তম জায়গা হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কার জুতা পরে সেখানে ঢোকার ও ছালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে জুতা পরে প্রবেশ করলে অপমান করা হয় না, আর শহীদ মিনারে জুতা পরে উঠলে অপমান করা হয়? এই শিক্ষা আপনারা কোথা থেকে পেলেন? আপনারা ভাষা শহীদের জন্য ভক্তি গদগদ চিত্তে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসব করছেন, কিসে শহীদদের প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণ হবে তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন? ভাষা শহীদদের জন্য আপনারা কয়দিন দো'আ করেছেন? কয়দিন তাদের জন্য মাগফিরাত

কামনা করেছেন? কয়দিন তাদের নাজাতের জন্য আল্লাহ্র কাছে কেঁদেছেন। তাদের জন্য কয় টাকা নিজে ছাদাক্বা করেছেন? এসব না করে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে, নীরবতা পালন করে নিজে যেমন শিরক করছেন, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিরক করাচ্ছেন। এভাবে আপনারা প্রতিনিয়ত ছাত্র-ছাত্রীদের ঈমান বিনষ্ট করে চলেছেন। এজন্য অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। লাবীবের কথায় একজন অভিভাবক বললেন, বাবা তুমি হাছা কইতাছো? তাইলে আমি আর আমার পোলারে এইহানে পড়ামু না। ওরে মাদ্রাসায় দিমু। তার কথায় সবাই সমস্বরে বলল, হ আমরাও আমাদের পোলা-মাইয়ারে মাদ্রাসায় দিমু। হাসানের বাবা বললেন, আপনে ওর শিক্ষক না অইলে আইজ আমিও বুঝাইতাম আমারে কতখানি কষ্ট দিছেন।

লাবীব সবাইকে থামিয়ে বলল, পিতারাও সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে শিরক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেমনে বাবা? লাবীব বলল, আমরা সন্তানদের কপালে কাল টিপ দেই এই বিশ্বাসে যে, তার প্রতি বদনযর লাগবে না। সন্তানদের কোমরে কালো সুতা বেঁধে দেই। অনেকে তাতে বিভিন্ন কড়ি গেঁথে দেই। একটু কিছু হ'লেই তাদের গলায় তাবীয ঝুলিয়ে দেই। এসব করি রোগ প্রতিরোধ কিংবা তাদের মঙ্গলের জন্য। অথচ এতে তাদের কোন উপকার হয় না; বরং ক্ষতি হয়। কারণ এসব শিরকী কাজ। এসবের জন্য আমাদেরকেও আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। লাবীবের কথায় সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে, ভবিষ্যতে তারা এসব করবে না। শিক্ষকও লজ্জিত হয়ে হাসানের বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বলল, না জেনে প্রশাসনের চাপে আমাদেরকে এসব করতে হয়। তবে যতদূর পারি আগামীতে এসব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। লাবীবকে বললেন, আপনি আমাদেরকে অনেক শিরকী বিষয়ে সতর্ক করলেন। এ ব্যাপারে আমরা নিজেরা সাবধান হব এবং অন্যদেরকেও সাবধান করার চেষ্টা করব। আপনার মত দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন সমাজে আরো দরকার।

শিক্ষা : শহীদ মিনারে ফুল দেয়া, নীরবতা পালন করা এসবই শিরক। এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮২. একজন কৃষকের আত্মবিশ্বাস

একজন কৃষক কৃষিকাজের মাধ্যমে তার অভাব-অনটন দূর করতে না পেরে ছালাত আদায় কালে আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে কিছু ধন-দৌলত তার চুলার কাছে পাবার আবেদন-নিবেদন করে। একদিন সে মাঠে চাষ করতে গেলে তার লাংগল একটি গাছের শিকড়ের সাথে বেঁধে যায়। সে তখন লাংগল বের করার জন্য শিকড় খুঁড়তে গিয়ে একটি কলস দেখতে পায়। কলসের মুখে ঢাকনা আঁটা। ঢাকনা খুললে সে কলস ভরা ধন-দৌলত দেখতে পায়। এতে সে মহা আনন্দিত হয়। কলসটি বাড়ী আনার সিদ্ধান্ত নেবার সাথে সাথে তার মনে পড়ে যায়, সে ধন-দৌলত পেতে চেয়েছিল তার চুলার কাছে, এখানে নয়। তাই সে ভাবল আল্লাহপাক সম্ভবতঃ তাকে পরীক্ষা করছেন। একারণে কলসটি পূর্বের অবস্থায় রেখে সে বাড়ী চলে আসে।

বাড়ী এসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে ঘটনাটি বলে। স্ত্রী তখন তাকে ঐ ধন-দৌলত আনতে অনুরোধ করে নিরাশ হয়। সে কিছুতেই ঐ ধন-দৌলত আনতে রাযী হ'ল না। তার বিশ্বাস, আল্লাহ তাকে ধন-দৌলত দিলে তার চুলার কাছেই দিবেন। স্ত্রী তাকে অনেক ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করে। তাকে রাযী করাতে না পেরে তার এক প্রতিবেশীকে সম্পদের খবর বলে এবং কোথায় কিভাবে আছে তাও স্বামীর বর্ণনা মোতাবেক বলে দেয়।

প্রতিবেশী লোকটি উৎসাহে বুক বেঁধে কোদাল হাতে নির্দিষ্ট স্থানে ছুটে যায়। অল্প মেহনতেই সে কলসটি দেখতে পায়। কিন্তু কি আশ্চর্য! কলসে তো কোন ধন নেই, আছে শুধু কলস ভরা বিষধর সাপ। লোকটির রাগ হ'ল। সে মনে করল, কৃষকের স্ত্রী তাকে বিপদে ফেলার জন্য মিথ্যা কথা বলেছে। তাই এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কলসের মুখটি ভালভাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কলসটি বাড়ী নিয়ে এল। উদ্দেশ্য, রাতের অন্ধকারে সে কলসটি কৃষকের চুলার কাছে রেখে মুখটি খুলে দিবে। যাতে কৃষকের স্ত্রী চুলার কাছে গেলে তাকে সাপে দংশন করে।

রাত ভোর হ'ল। কৃষকের স্ত্রী রান্না-বান্না করার জন্য চুলার কাছে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, চুলার চার পাশে অনেক ধন-দৌলত রয়েছে। সে তার স্বামীকে ডেকে আনল। স্বামী বলল, আমার মনে এ বিশ্বাস ছিল। আল্লাহপাক

আমাকে ধন-দৌলত দিলে আমার চুলার কাছেই দিবেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে সে প্রার্থনাই করেছিলাম। স্ত্রী স্বামীকে ভর্ৎসনা ও গালমন্দের জন্য তার নিকট ক্ষমা চাইল। এখন থেকে পরম সুখে স্বামী-স্ত্রীর দিন কাটতে লাগল।

শিক্ষা : নিজের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে। দেওয়ার মালিক তিনিই।

৮৩. নিঃসঙ্গ

নারীর জীবনে আজন্ম লালিত স্বপ্ন থাকে একটা সুন্দর সংসার, স্বামীর ভালবাসা, সন্তানের মা ডাক প্রভৃতির। একজন নারী সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বামীর সংসারকে আগলে ধরে রাখে স্বামীর নিখাদ ভালবাসার জন্য। সন্তান গর্ভ ধারণে, প্রতিপালনে সীমাহীন কষ্ট করে সন্তানের 'মা' ডাক শোনার জন্য। স্বামীর প্রেমের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারী তার সকল কষ্ট ভুলে যায় নিমিষে, সন্তানের মা ডাকে তার সকল বেদনা দূর হয়ে যায়। কলিজা জুড়িয়ে যায়। এসব থেকে যে বঞ্চিত হয়, সে ভাবে তার জীবনটা অর্থহীন। এ বিষয়ে নিম্নের গল্পটি।

সামিয়া উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্ছল তরুণী। সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ, টানা দু'টি ভরাট চোখ, এক কথায় অপূর্ব চেহারা তার। পিতার বিশেষ স্নেহ-মমতায় আর দশটা মেয়ের চেয়ে একটু আলাদাভাবে সে বেড়ে উঠেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অমায়িক একটি মেয়ে সে। উচ্ছলতা থাকলেও উচ্ছৃংখলতা তার মাঝে নেই। মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় সে অনন্য। কোন ছেলের মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে সে কখনও কারো দিকে ঝুঁকে পড়েনি। নিজের সতীত্বের প্রতি সে ছিল সর্বদা সজাগ।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, এভাবে তার জীবনের ২৩টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। একদিন বাবা মহা ধুমধামে আদরের মেয়েকে তুলে দেন একটি ছেলের হাতে। মেয়ের সুখের কথা ভেবে সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে দেন। যে সুখের জন্য বাবা এতকিছু করলেন মেয়ের কপালে সে সুখ জুটল না। হাতের মেহেদীর রং মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার স্বামী মারা যায়। সামিয়া দু'চোখে

অন্ধকার দেখে। কি করবে সে? মেয়ের এই খবরে পিতা স্ট্রোক করেন। দশ দিন মারাত্মক অসুস্থ থাকার পর অবশেষে পরপারে পাড়ি জমান তিনি। সামিয়া দু'দিক দিয়েই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। নারীর জন্য যে দু'টি নিরাপদ আশ্রয় থাকে পিতা ও স্বামী কোনটিই তার অবশিষ্ট রইল না। একসময় সে ফিরে আসে ভাইদের সংসারে। সন্তানহীনা সামিয়া মা ডাক শোনার জন্য ও একাকীত্ব ঘুচানোর জন্য একটি কন্যা সন্তান দত্তক নেয়। এই সন্তানের পিছনেই তার সময় কেটে যায়। জীবনের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে সে ঐ সন্তানকে মানুষ করার জন্য চেষ্টা করছে। মেয়েটিও পড়ালেখায় ভাল। দিন যত যায়, সামিয়ার চিন্তা তত বাড়ে। কারণ একদিন এই মেয়েও তাকে ছেড়ে চলে যাবে পরের বাড়ী। তখন সে আবার নিঃসঙ্গ একা হয়ে যাবে। ভাইদের সংসারের শত গঞ্জনা উপেক্ষা করেও সে কেবল মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে। বিবাহের বহু প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তার একটাই চিন্তা মেয়ের জীবনেও যেন তার মত পরিণতি না আসে।

দিন গড়িয়ে যায়। সামিয়ার মেয়ে আজ পরিণত বয়সে উপনীত। মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তায় সে ব্যাকুল। সে ভাবে কেমন ছেলের ঘরে তার মেয়ে গিয়ে পড়বে? তার মেয়েটি সুখী হবে তো? এসব ভাবনার মধ্যে একদিন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত স্বভাবের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলের হাতে সামিয়া মেয়েকে তুলে দেয়। মেয়ের জন্য যথাসাধ্য সাংসারিক জিনিসপত্র কিনে দেয়। অনেক ধনীর দুলালরা প্রস্তাব দিলেও দ্বীনদার না হওয়ায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সামিয়া।

আজ দ্বীনদার ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পেরে সামিয়া আনন্দিত, ভারমুক্ত। সে ভাবে মেয়ে আমার দ্বীনী পরিবেশে থাকবে, ছালাত-ছিয়াম পালন করবে, আমার মরার পর তারা আমার জন্য দো'আ করবে- এটাই আমার পরম পাওয়া।

এসবের মাঝেও সামিয়া আজ একা, নিঃসঙ্গ সে। ভাই-ভাবী আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা আছে। তবুও সে আজ একা, বড় একা। একা এই পৃথিবীতে এসেছিল, আবার তাকে একাই ফিরে যেতে হবে। এজগৎ সংসারে তার যেন আপন কেউ নেই।

শিক্ষা : আখেরাতের প্রথম মনযিল কবরের একাকীত্বের সময় কেউ সঙ্গী হবে না সৎ আমল ব্যতীত। অতএব এখুনি আমাদেরকে সাবধান হয়ে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে।

৮৪. দুঃস্বপ্নের কালো টাকা

আমীন অনার্স-মাস্টার্স পাশ একজন টগবগে যুবক। অন্যান্য ছেলেদের মতো তাকে চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়নি বেশী দিন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ছয় মাসের মধ্যে চাকরি জুটে গেল। খুব ভাল চাকরি। বড় অফিসার পদে। বেতনও বেশ ভাল। কিন্তু পরিশ্রমটা একটু বেশী। সেই সকাল ৮-টা থেকে রাত ৮-টা পর্যন্ত।

স্বতঃস্ফূর্ততা, কর্মচাঞ্চল্য ও সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে সে অল্প সময়ের মধ্যে অফিসের ছোট-বড় সবার মন জয় করে ফেলে। সে অফিসের কাজে খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক। তার হাযিরা খাতায় কোনদিন লালকালির দাগ পড়েনি।

পানির স্রোতের মতো দিন বয়ে চলল। ইতিমধ্যে চাকরি জীবনে তার পঞ্চম বছরে পদার্পণ। সফলতার সাথে এ বছরটা চোখের পলকে কেটে গেল। ষষ্ঠ বছর চলছে। সেদিনটির কথা আজো তার ভাল স্মরণ আছে। ভুলে যাবে কি করে? দিনটি ছিল সোমবার। সকাল ৭-টায় ঘুম ভাঙ্গলো। জানালা দিয়ে বাইরে সোনাঝরা রোদ্দুর চারিদিকে ঝলমল করছে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে কোন এক অজানা আনন্দে নিজে নিজে হাসল আমীন। তারপর গোসলের জন্য বাথরুমে ঢুকে সাবান-শ্যাম্পু মেখে খুব ভাল করে গোসল করল। মিনিট দশেক ব্যয় হ'ল তাতে। এবার চিরুনি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আয়নায় চোখ পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। হৃদপিণ্ডটায় যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। হাতুড়ী পেটানোর শব্দ যেন সে নিজের কানেও শুনতে পাচ্ছে। নিজের অজান্তেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। আয়নার কাছ থেকে ২-৪ পা পিছিয়ে আসল সে। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হ'ল শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভূত দেখার মত মনে হ'ল। সেকি! তাজ্জব ব্যাপার।

নির্বাক পাথরের মত কত সময় দাঁড়িয়ে ছিল সে তা বলতে পারবে না। নিজের মধ্যে শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে এক পা দু'পা করে আয়নার খুব কাছে চলে গেল

সে। হাত দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। তাইতো নাক গেল কোথায়? হাওয়া হয়ে গেল নাকি? সে মনে করল, গত রাতে হয়তো কেউ তা চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে তো রক্তের দাগ থাকবে। তাও তো নেই। তাকে কত বীভৎস দেখাচ্ছে। কিন্তু এমন তো হবার কথা ছিল না।

এতক্ষণে নিজেকে সে আবিষ্কার করল। সমস্ত শরীরে শীতের বরফ জমা বিশাল পাহাড়। শরীর এত ভারী মনে হ'ল যে, পা তোলার ক্ষমতা নেই। অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল। সোজা চলে গেল জানালার পাশে। রাস্তায় ভ্রাম্যমাণ সবারই তো নাক ঠিক জায়গায় আছে। তাহ'লে তারটা গেল কোথায়?

মেঘাচ্ছন্ন মুখ-চোখে কষ্টের লোনা পানি নিয়ে আমীন একবার খাটের উপর বসছে আবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছে। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হ'ল। এমন ভয়ংকর ঘটনা দেখা তো দূরের কথা পত্র-পত্রিকায়ও তো কোনদিন পড়েনি সে। অস্থির ছটফটানিতে কেটে যাচ্ছে সময়। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সকাল সাড়ে দশটা।

খাটের উপর নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। তাও অস্বস্তি লাগছে তার। হঠাৎ তার বাড়ীর কথা মনে পড়ল। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, কত বন্ধু-বান্ধব ওদের সামনে সে এ অবস্থায় কিভাবে দাঁড়াবে? ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে যাচ্ছে। হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠলো। কিছুই ভাবতে পারছে না। মাথা ঘুরছে। চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ল আমীন।

গত দু'দিন আগে আমীনের কাছে আসাদ ছাহেব এসেছিলেন একটা যরূরী কাজে। তার সমস্ত কিছু শুনল। ঘাড় নেড়ে আসাদ ছাহেবকে বলল, ব্যাপারটা বড় গুরুতর। তিনি পাশে এসে হাত ধরে বললেন, ভাই আমাকে উদ্ধার করেন নইলে...? গম্ভীর কণ্ঠে বলল, পনের হাযার টাকা দিতে হবে। টাকার অংকটা শুনে তার চোখ ছানাবড়া। তিনি একটু কম দিতে চাইলেন। আমীন একেবারে না করল। অবশেষে কি আর করা? পুরো টাকাটাই দিয়ে গেলেন আসাদ ছাহেব। টাকাগুলি তাড়াতাড়ি নিয়ে আলমারির মধ্যে তালাবদ্ধ করল আমীন। মনের ভিতরে অনাবিল আনন্দ বয়ে যেতে লাগল তার।

সেদিনের কথা আজ শুয়ে চিন্তা করছে, এটা নিশ্চয়ই তার পাপের প্রতিফল। এমন নাজুক অবস্থায় মনুষ্য সমাজে বাস করা সম্ভব নয়। লজ্জায় মুষড়ে পড়ল

সে। জীবন থেকে সে পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্ত নিল। আজ রাতই হবে তার জীবনের শেষ রাত। ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা ৬-টা। আবারও আয়নার কাছে গেল। সিদ্ধান্ত নিল আগে এই পাপের টাকাগুলি ফিরিয়ে দেবে, তারপর দুনিয়ার মায়াজাল ত্যাগ করবে।

তড়িৎ গতিতে উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে নিল। পাপের টাকাগুলি আলমারি থেকে বের করে থলে ভর্তি করল। বড় একখানা রুমাল মুখ বরাবর চেপে ধরে বের হ'ল। একটি রিক্সা ডেকে সরাসরি আসাদ ছাহেবের বাসার দিকে ছুটল। গিয়ে টাকার ব্যাগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে আসল আমীন। আসাদ ছাহেব মূর্তির মত তাকিয়ে থাকল। কিছু বলতে গেল কিন্তু...? রিক্সায় আবার চেপে বসল আমীন। রিক্সা আপন গতিতে চলছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হ'ল সবাই তো বেশ সুখেই চলছে। কিন্তু আমার একি হ'ল? পৃথিবী ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তটি চারিদিকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। আল্লাহ্র সৃষ্টি পৃথিবী কতই না সুন্দর! নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। নিজের জীবনের জন্য একটু দুঃখিত হ'ল।

সামনে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে তার বাসা। রুমালের ভিতরে শক্ত অনুভূতি টের পেল। ছলকে উঠলো বুকের রক্ত। চমকে উঠল সে। আবার কি হ'ল? ভয় পেল কিছুটা। ভয়ে চুপচাপ বসে আছে। বুকের ভিতরে কি যেন অনুভূতি জোরে জোরে লাফাচ্ছে। রিক্সা তার বাসার সামনে রাখল। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দ্বিগুণ দিল। ড্রাইভার তার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকল।

সোজা রুমে ঢুকে দরজার ছিটকিনী আটকে দিল আমীন। আয়নার সামনে গিয়ে ভয়ে ভয়ে রুমাল সরালো। দেখেই আনন্দে নেচে উঠল তার মন, চিৎকার দিয়ে উঠল সে। এবার নাকতো ঠিক জায়গায়ই আছে। সে নিখুঁতভাবে দেখতে লাগল। ঠিক জায়গায়ই তো নাক আছে। পরম সুখে চোখের কোণে অশ্রু এসে গেল। মনে পড়লো তার আজ সোমবার। বৃহস্পতি ও সোমবার তওবা কবুলের দিন। তাই সে তওবা করল। আর নয় পাপের পথে উপার্জিত টাকার লোভ। এখন থেকে হালাল পথে উপার্জন করব; সৎ ও সুন্দরভাবে বাঁচবো। এটা আমীনের দৃঢ় সংকল্প।

শিক্ষা : অন্যায় পথে যে অর্থ উপার্জন করে, সে অর্থবিত্তের মালিক হ'লেও মানসিকভাবে কখনই স্বস্তির মধ্যে থাকতে পারে না। সর্বদাই পাপের অনুভূতি তাকে তাড়া করে। অন্তর থেকে প্রশান্তি ও মনুষ্যত্বের ছোঁয়া লোপ পেয়ে যায়। এটা তার দুনিয়াবী শাস্তি। পরকালে তার জন্য অপেক্ষা করছে আরো মর্মান্তিক শাস্তি। তাই সময় থাকতেই তওবা করে নেয়া আবশ্যক।

৮৫. নাছিরুদ্দীন হোজা ও এক দুঃখবিলাসী

একবার নাছিরুদ্দীন হোজা এক লোককে পথের ওপর খুব বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে দেখল। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই লোকটি বলল, তার অনেক ধন-সম্পত্তি। খাওয়া-পরা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু তার কিছুই ভালো লাগে না। জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান কোনোকিছুই আর তাকে আকর্ষণ করে না। এ অস্থিরতা সইতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে।

হোজা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলেন। হঠাৎ কিছু না বলেই পাশে রাখা লোকটির কাপড়ের ব্যাগটি নিয়ে দিলেন দৌড় এবং নিমেষেই হাওয়া হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই লোকটিও পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু হোজাকে পায় কে? অনেকদূর যাওয়ার পর রাস্তার ওপর এক জায়গায় ব্যাগটি রেখে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলেন হোজা। এদিকে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত, অবসন্ন, উদ্বিগ্ন লোকটি যখন এখানে এসে তার ব্যাগটি খুঁজে পেল, আনন্দে চিৎকার করে সে বলে উঠল, পেয়েছি! পেয়েছি! এইতো আমার ব্যাগ। বহুদিন সে এত খুশি হতে পারেনি। হোজা আড়াল থেকে হেসে বললেন, দুঃখবিলাসীদের এভাবেই শায়েস্তা করতে হয়।

শিক্ষা : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَـــى الــنَّفْسِ 'সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত প্রাচুর্য নয়। বরং অন্তরের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭০)*।

৮৬. অতি চালাকের গলায় দড়ি

এ জগতে অনেক মানুষ আছে, যারা অন্যের ভাল দেখতে পারে না। অন্যের সুখে তাদের গা জ্বালা করে। ফলে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করে। পরের অকল্যাণ চিন্তা সদা তাদের মাথায় ঘুরপাক খায়। অনেক সময় অন্যের ক্ষতি সাধন করতে গিয়ে নিজেই সেই ক্ষতির শিকার হয়। এ সম্পর্কেই নিম্নের গল্পটির উপস্থাপনা।-

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে বাস করত এক বুড়ি। বুড়ির ছিল এক নাতী। বুড়ি তার নাতিকে খুব ভালবাসত। বুড়ি একদিন তার মেয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। তার নাতী তার বাড়ি দেখাশুনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে সব কাজই করে থাকে। বুড়ি যেমন করে সবকিছু রেখে গিয়েছিল তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। পাঁচ-ছয়দিন পর বুড়ি বাড়ি আসে। তার নাতীর কাজ দেখে সে খুব খুশি হয়। নাতীকে আদর করে এবং তার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র দরবারে দো‘আ করে।

একদিন বুড়ি বাড়ীর পাশে পাতা কুড়াতে গিয়ে দেখে একটি মেয়ে গাছের তলায় বসে কাঁদছে। বুড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছ কেন? মেয়েটি বলল, আমার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই, আমি ইয়াতীম। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভীষণ মিথ্যাবাদী। তার মা-বাবা সবাই ছিল, কিন্তু সে বাড়ি থেকে ঝগড়া করে এসে ঐ গাছতলায় বসে কাঁদছিল। বুড়িকে সে মিথ্যা কথা বলেছিল। মেয়েটিকে দেখে বুড়ির খুব দরদ হ’ল। সে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি গেল। পরে তার নাতীর সাথে মেয়েটির বিয়ে দিল। বিয়ের কিছুদিন পর মেয়েটি বুড়িকে সত্য কথা বলল এবং তার বাবার বাড়ি যাবার বায়না ধরল।

এরপর থেকে মেয়েটি মাঝে মাঝে তার বাবার বাড়ি যেত। তার এক ছোট ভাই তার কাছে আসা-যাওয়া করত। সে সংসারের জিনিসপত্র গোপনে বাবার বাড়ি নিয়ে যেত। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারত না। এতে ধীরে ধীরে বুড়ির সংসার ধ্বংস হ’তে থাকে। বুড়ির সঞ্চয় সব ফুরাতে থাকে। ইতিমধ্যে তার নাতীর এক কন্যা হয়। বুড়ি খুব চিন্তিত। সে ভাবে এমনিতেই তো সব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আবার এই শিশুর খাদ্য জুটবে কিভাবে? তার নাতী খুব কাজ

করে, কিন্তু অভাব দূর হয় না? বুড়ির নাতবউ গোপনে সংসারের জিনিস তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় তাদের সংসারের এ দৈন্যদশা। সে নিজের সংসার এমনকি তার কন্যার কথাও চিন্তা করত না। এদিকে তার মেয়েটি বড় হ'তে থাকে। সে অনেক চালাক-চতুর।

একদিন বুড়ি একটা কাপড় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এনে ঘরে তুলে রাখে। বুড়ির নাতবউ তা দেখে ফেলে এবং মনে মনে ভাবে, তার ভাই আসলে তা বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু সেদিন তার ভাই আসেনি। তাই সে তার মেয়েকে বলল, মা তুমি তোমার নানার বাড়ি যাও এবং এই শাড়িটা তোমার নানীকে দিয়ে এস। মেয়ে বলল, এটাতো বড় মায়ের শাড়ি। মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নাতবউ শাড়িটি বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বুড়ি এসে দেখে তার কাপড়টি নেই। তখন সে অঝোরে কাঁদতে থাকে। মেয়েটি এসে জিজ্ঞেস করে, বড় মা তুমি কাঁদছ কেন? বুড়ি সব খুলে বলল। মেয়েটি বলে, আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর সে সবকথা বলে দেয়। এভাবে সংসারের বিভিন্ন জিনিস খোয়া যাওয়ার উৎস ও কারণ বুড়ির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে তার নাতী আসলে সব খুলে বলে। আড়ালে থেকে বুড়ির নাতবউ শুনে ফেলে। বুড়ির নাতী তখন তার বউকে মারধর করে, তাকে শাসন করে। তার এই কাজের জন্য যারপর নেই ভর্ৎসনা করে। এতে সে ক্ষেপে যায় এবং মনে মনে ভাবে বুড়িকে জব্দ করতে হবে। একদিন বুড়ি তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। বুড়ির নাতী কাজের সন্ধানে বাড়ী থেকে অনেক দূরে চলে যায়, ফেরে অনেক রাত করে। এসেই সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে সুযোগ পেয়ে বুড়ির নাতবউ ঘরে বিরাট গর্ত খোড়ে। তাতে কাঁটা, কাঁচের টুকরা, গোবর, কাঁদা-পানি সহ অনেক কিছু দিয়ে রাখে। উপরে আলতোভাবে পাটি বিছিয়ে রাখে, যাতে সহজে বুঝা না যায় যে, নীচে গর্ত আছে।

বুড়ি এলে তার নাতবৌ তাকে খুব সমাদর করে, যা বুড়ি কোনদিন পায়নি। এতে বুড়ি অবাক হয়, খুশীও হয়। কিন্তু আসল মতলব বুঝতে পারে না। এবার বুড়িকে ঘরে নিয়ে যায়। তাকে ঐ স্থানে বসতে দেওয়া হয়। বুড়ি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে। এদিকে নাতবৌ বুড়িকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে নিজেই ধপাস করে গর্তে পড়ে যায়। বুড়ি ভয় পেয়ে

দৌড়ে বাইরে যায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে নাতবৌকে তুলতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সবশেষ। বুড়ি তাকে তুলতে পারে না। ইতিমধ্যে তার নাতী এসে পড়ে। ঘরে গিয়ে দেখে তার বউ গর্তে মরে পড়ে আছে। ঘরের মাঝে গর্ত দেখে সে বউয়ের কু-মতলব সব বুঝতে পারে।

শিক্ষা : অন্যের জন্য গর্ত খোঁড়া হ'লে তাতে নিজেই পড়তে হয়।

৮৭. জীবনের বিনিময়ে সতীত্ব রক্ষা

সতীত্ব সতী-সাধ্বী নারীর মূল্যবান সম্পদ। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে সে জীবন দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। খাত্তাবী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আসমানী ইনসাফ'-এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে এক কসাই ছিল। ফজরের আগেই সে দোকানে চলে যেত। সে ছাগল-মেষ যবেহ করে অন্ধকার থাকতেই বাড়ী ফিরে আসত। একদা ছাগল যবেহ করে বাড়ি ফিরছিল। তখনো রাতের আঁধার কাটেনি। সেদিন তার জামা-কাপড়ে অনেক রক্ত লেগেছিল। পথিমধ্যে সে এক গলির ভিতর থেকে একটা কাতর গোঙানি শুনতে পেল। সে গোঙানিটা লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেল। হঠাৎ সে একটা দেহের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। একজন আহত লোক পড়ে আছে মাটিতে। যখম গুরুতর। বাঁচাতে হ'লে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। তখনো দেহ থেকে দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। ছুরিটা তখনো দেহে গেঁথে আছে। দ্রুত সে ছুরিটা ঝটকা টানে বের করে ফেলল। তারপর লোকটিকে কাঁধে তুলে নিল। কিন্তু লোকটি পথে তার কাঁধেই মারা গেল।

এর মধ্যেই লোকজন জড়ো হ'ল। কসাইয়ের হাতে ছুরি। সদ্য মৃত লোকটির গায়ে তাজা রক্ত। এসব দেখে লোকজনের নিশ্চিত ধারণা হ'ল যে, সেই ঘাতক। অগত্যা তাকে হন্তারক হিসাবে অভিযুক্ত হ'তে হ'ল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

যখন তাকে 'ক্বিছাছ'-এর জায়গায় আনা হ'ল এবং মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন সে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'হে উপস্থিত জনতা! আমি

এই লোকটিকে মোটেই হত্যা করিনি। তবে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অপর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলাম। আজ যদি আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাহ'লে এই ব্যক্তির হত্যার কারণে নয়, বরং সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য হ'তে পারে'।

অতঃপর সে বিশ বছর আগের হত্যার ঘটনাটি বলা শুরু করল- আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক টগবগে যুবক। নৌকা চালাতাম। লোকজনকে পারাপার করা ছিল আমার নিত্যদিনের কাজ। একদিন এক ধনবতী যুবতী তার মাকে নিয়ে আমার নৌকায় পার হ'ল। পরদিন আবার তাদেরকে পার করলাম। এভাবে প্রতিদিনই আমি তাদেরকে আমার নৌকায় পার করতাম।

এ পারাপারের সুবাদে যুবতীটির সাথে আমার আন্তরিকতা গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম। এক সময় আমি তার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মত দরিদ্র এক মাঝির কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেও এদিকে আর আসত না। সম্ভবত মেয়েটির বাবা নিষেধ করে দিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারলাম না। এভাবে কেটে গেল ২/৩ বছর। একদিন আমি নৌকা নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় এক মহিলা ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হ'ল এবং আমাকে নদী পার করে দিতে অনুরোধ করল।

আমি তাকে নিয়ে রওয়ানা হ'লাম। মাঝ নদীতে এসে তাকালাম তার চেহারার দিকে। চিনতে দেরী হ'ল না যে, এ আমার সেই প্রেয়সী। এর পিতা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে না দিলে সে আজ আমার স্ত্রী হতে পারত। আমি তাকে দেখে খুশি হ'লাম। বিভিন্ন মধুময় স্মৃতির ঝাঁপি একে একে তার সামনে মেলে ধরতে লাগলাম। সে খুব সতর্কতা ও বিনয়ের সাথে উত্তর দিচ্ছিল। পরক্ষণেই সে জানাল যে, সে বিবাহিতা এবং সঙ্গের শিশুটি তারই সন্তান। আমার মন বড় অস্থির হয়ে গেল। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। একটা অশুভ ইচ্ছা আমাকে তাড়া করল। এক পর্যায়ে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের

জন্য আমি তার উপর চাপাচাপি শুরু করলাম। সে আমাকে মিনতি করে বলল, আল্লাহকে ভয় কর! আমার সর্বনাশ কর না'।

আমি তার কথা শুনলাম না। নিবৃত্ত হ'লাম না। তখন অসহায় নারীটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগল। তার শিশু কন্যাটি চিৎকার করতে লাগল। আমি তখন তার শিশু কন্যাটিকে শক্ত হাতে ধরে বললাম, তুমি আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে তোমার সন্তানকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মারব। তখন সে কেঁদে উঠল। হাত জোড় করে মিনতি জানাতে লাগল। কিন্তু আমি এমনই অমানুষে পরিণত হ'লাম যে, নারীর অশ্রু ও কান্না কিছুই আমার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেয়ে মূল্যবান মনে হ'ল না। আমি নিষ্ঠুরভাবে শিশু কন্যাটির মাথা পানিতে চেপে ধরলাম। মরার উপক্রম হ'তেই আবার বের করে আনলাম। বললাম, জলদি রাযী হও, নইলে একটু পরই এর লাশ দেখবে। কিন্তু সে যুগপৎ সন্তানের মায়ায় এবং সতীত্বের ভালবাসায় বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, যা আমার কাছে ছিল অর্থহীন, মূল্যহীন।

আমি আবার মেয়েটিকে পানিতে চেপে ধরলাম। শিশুটি হাত-পা নাড়ছিল। জীবনের বেলাভূমিতে আরো অনেক দিন হাঁটার স্বপ্নে দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ছিল। কিন্তু ওর জানা ছিল না কেমন হিংস্রের হাতে সে পড়েছে। এবার আমি তার মাথাটা তুলে আনলাম না। ফল যা হবার তাই হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

আমি এবার তাকালাম তার দিকে। কিন্তু মেয়ের করুণ মৃত্যুও তাকে নরম করতে পারল না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়, অবিচল। তার দৃষ্টি যেন বলছিল 'সন্তান গেছে, প্রয়োজনে আমিও যাব। জান দেব। তবু মান দেব না'। কিন্তু আমার মনুষ্য সত্তা হারিয়ে গিয়েছিল। আমার মাঝে রাজত্ব করছিল শুধু আমার পশু-সত্তা। আমি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তার দিকে এগিয়ে গেলাম। চুলকে মুষ্টিবদ্ধ করলাম। তারপর তাকেও পানিতে চেপে ধরলাম। বললাম, ভেবে দেখ জলদি; জীবনের মায়া যদি কর তবে আবার ভাব'। সে ঘৃণাভরে না বলে দিল। আমিও তাকে চেপে ধরে রাখলাম। এক সময় আমার হাত ক্লান্ত হয়ে এল। সাথে সাথে তার দেহটাও নিথর হয়ে গেল। আমি ওকে পানিতে ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম। খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানল না। মহান সেই

সত্তা, যিনি বান্দাকে সুযোগ দেন। কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দেন না। এই করুণ কাহিনী শুনে উপস্থিত সবার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এরপর তার শিরোশ্ছেদ করা হ'ল।

শিক্ষা : সতীত্ব নারীর অমূল্য সম্পদ। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষায় ঐ সতী-সাধ্বী নারী নিজের মেয়েকে নিজের চোখের সামনে মরতে দেখেও আপোষ করল না। নিজের জীবন দিল। তবুও নিজের মান সে বিলিয়ে দিল না।

৮৮. ইনছাফপ্রিয় বাদশাহ

বাদশাহ মালিক শাহ সালজুকী রাজধানী নিশাপুরে অবস্থান করছিলেন। তখন মহিমান্বিত রামাযান মাসের বিদায় ঘণ্টা বাজার উপক্রম। রামাযান শেষে তিনি রাজ্যের সর্বত্র পরিদর্শনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ঈদের পরেই সফরে বের হবেন। সুতরাং ২৯শে রামাযানে তিনি তার মন্ত্রীবর্গ ও সাথীদের নিয়ে চাঁদ দেখতে বের হ'লেন। কিছু আমলা হৈচৈ শুরু করে দিল- 'চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে' বলে। যদিও বাদশাহ ও তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ চাঁদ দেখেননি। কিন্তু বাদশাহর অভিপ্রায় জেনে সবাই আগামী কাল ঈদের ঘোষণা দিল।

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী তদানীন্তন নিশাপুরের প্রধান মুফতী ও বিচারপতি ছিলেন। তিনি আগামীকালের ঈদের কথা জানতে পেরে সারা দেশে ঘোষণা করে দিলেন- আগামী কাল পর্যন্ত রামাযান মাস। সুতরাং যে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করতে চায় সে যেন অবশ্যই আগামীকাল ছিয়াম পালন করে।

ঈদের আনন্দে নিশাপুরবাসী যখন ফূর্তিতে মত্ত ছিল, ঠিক সেই সময় ইমামুল হারামাইনের ঘোষণায় তারা অভিভূত হ'ল। বাদশাহর নির্দেশমত আগামীকাল যদি ঈদ না হয়, তবে সেটা বাদশার জন্য অপমানজনক হবে। সুলতান বদমেযাজী ছিলেন না। তাই ইমামুল হারামাইনের ঘোষণায় দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও নির্দেশ দিলেন, তাকে সসম্মানে রাজদরবারে হাযির করা হোক। দুষ্ট প্রকৃতির মন্ত্রীরা বাদশাহকে ক্ষেপাবার জন্য বলল, যে ব্যক্তি বাদশাহর নির্দেশ অমান্য করে, সে কখনো সম্মানের পাত্র হ'তে পারে না।

বাদশাহ মুফতী ছাহেবের প্রতি রাগান্বিত হ'লেও ধৈর্যের সাথে রাগ দমন করে বললেন, আমি তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে চাই। প্রকৃত বিষয় না জেনে কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অসম্মান করা মোটেও সমীচীন নয়। বিচারপতির নিকট শাহী পয়গাম পাঠানো হ'ল। বিচারপতি পয়গাম পেয়ে মনে করলেন, দরবারী পোশাক পরতে গেলে হয়তবা দেরী হয়ে যাবে। তাই তিনি যে পোশাকে ছিলেন ঐ পোশাকেই রাজদরবারে রওনা হ'লেন।

দরবারের প্রধান ফটকে তাকে বাধা দেওয়া হ'ল। কারণ সাধারণ পোশাকে রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ। ঐদিকে হিংসুটে লোকেরা বাদশাকে উসকে দিয়ে বলল, এ ব্যক্তি আপনার হুকুম অমান্য করেছে। আবার সাধারণ পোশাকে রাজদরবারে এসে আপনার সাথে বেয়াদবী করেছে। বাদশাহর মেযাজ আরো বিগড়ে গেল। তবুও তিনি বিচারপতিকে শাহীমহলে আসার অনুমতি দিলেন। বিচারপতি ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে বললেন, এ অবস্থায় আপনি কেন আসলেন? দরবারী পোশাক পরেননি কেন?

এবার বিচারপতি আবুল মা'আলী নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, হে বাদশাহ! এখন আমি যে পোশাক পরে আছি, তাতেই আমি ছালাত আদায় করি, যা শরী'আতে জায়েয। সুতরাং যে পোশাকে আমি বিশ্বচরাচরের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্র দরবারে হাযির হ'তে পারি, সে পোশাকে আপনার দরবারে আসা কি অন্যায়? তবে হ্যাঁ! নিয়ম অনুযায়ী এ পোশাক দরবারী নয় বলে এটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত নয়। কারণ আমি ভেবেছি, দেরীতে আসলে আমার দ্বারা মুসলিম বাদশাহর নির্দেশ লঙ্ঘন না হয়ে যায় এবং ফেরেশতারা যেন আমার নাম নাফরমানদের খাতায় না লিখে নেন। এজন্য আমি যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় চলে এসেছি।

বাদশা বললেন, যদি ইসলামী বাদশাহ্র আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য হয়, তাহ'লে আমার নির্দেশের বিপরীতে ঘোষণা দেওয়া হ'ল কেন?

বিচারপতি বললেন, যেসব বিষয়ের নির্দেশ বাদশাহর উপর ন্যস্ত, সেসব ব্যাপারে বাদশাহ্র আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু যেসব বিষয় ফৎওয়ার উপর নির্ভরশীল, তা অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে হ'তে হবে।

সুতরাং বাদশাহ হোক বা অন্য কেউ হোক আমার কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল এবং শাহী নির্দেশ শারঈ বিধান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক ছিল।

প্রধান বিচারপতি মুফতী আবুল মা'আলীর বক্তব্য শুনে বাদশার রোষের অনল নিভে গেল। ইমাম ছাহেবের দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসিকতার পরশে বাদশার হৃদয় মালঞ্চে খুশি ও প্রীতির ফুল ফুটল। তিনি ইমাম ছাহেবের সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা ভুল ছিল। প্রধান বিচারপতির ফায়ছালাই সঠিক।

শিক্ষা : ১. আলেম-ওলামা যদি সততা ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের উপর অবিচল থাকেন, তাহ'লে সরকার তাকে সম্মান করতে বাধ্য হবে।

২. যিনি যত বড় দায়িত্বশীল, তাকে তত বেশী ধৈর্যশীল হ'তে হয়। বিশেষ করে কোন রাষ্ট্রে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে সরকারকে অবশ্যই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। ধৈর্যহীন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা দলের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নয়।

৩. সরকারের সাথে সব সময় একদল ধূর্ত ও চাটুকার লোক থাকে, যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীতিবান মানুষের গলায় অপবাদের উন্মুক্ত কৃপাণ চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

৪. কোন বিষয়ে পরিষ্কারভাবে অবগত না হয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া আদৌ কোন আদর্শ শাসকের পরিচয় নয়।

৫. দেশের আলেম-ওলামা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

৬. সরকারের শরী'আত বিরোধী কোন নির্দেশ মানতে জনগণ বাধ্য নয়।

[মালিক শাহ সুলতান আরসালান সালজুকীর পুত্র ছিলেন। তিনি ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিশাপুর এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বাগদাদ, হারামাইন শরীফাইন এমনকি বায়তুল মাক্বদিসেও তার নামে খুৎবা পড়া হ'ত। তিনি ১৫ শাওয়াল ৪৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮ নভেম্বর ১১০৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমেই সালজুকী রাজত্বের অবসান ঘটে]

৮৯. মুসলমানদের বিজয়ের গূঢ় রহস্য

প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের বিশ্বজয়ের মূল শক্তি ছিল আল্লাহ্‌র উপরে অটুট নির্ভরতা। তৎকালীন পরাশক্তি রোম সেনাপতি বারবার পরাজিত হয়ে ১৩ হিজরীতে ইয়ারমূকের পূর্বে আজনাদাইন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার এক দুঃসাহসী ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব খৃষ্টান গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রেরণ করেন। গুপ্তচর মুসলিম সেনা শিবিরে কয়েকদিন অবস্থান শেষে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, তা ছিল নিম্নরূপ : هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوْا يَدَهُ وَلَوْ زَنَى رَجَمُوْهُ– ‘তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তাদের শাসকপুত্র চুরি করে, তাহ’লে তারা তার হাত কেটে দেয়। অথবা যদি যেনা করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে ফেলে’। একথা শুনে সেনাপতি ক্বায়কুলান বলে ওঠেন, وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَنَا مِنْ ظَهْرِهَا ‘আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহ’লে ভূগর্ভ আমাদের জন্য উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের চাইতে’। অর্থাৎ আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে উক্ত সেনাপতি নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পরবর্তীতে ১৬ হিজরীতে শাম থেকে নিরাশ হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ফিরে গিয়ে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর এক গুপ্তচরকে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, هُمْ فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ وَرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، لاَ يَأْكُلُونَ فِي ذِمَّتِهِمْ إِلاَّ بِثَمَنٍ، وَلاَ يَدْخُلُونَ إِلاَّ بِسَلاَمٍ، يَقِفُوْنَ عَلَى مَنْ حَارَبُوْهُ حَتَّى يَأْتُوا عَلَيْهِ. ‘তারা দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার ও রাতের বেলায় ইবাদতগুযার। তারা তাদের যিম্মায় থাকা কোন বস্তু মূল্য না দিয়ে খায় না এবং শান্তির বার্তা ব্যতীত কোন স্থানে প্রবেশ করে না।

যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না তারা পরাজিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসে'। একথা শুনে রোম সম্রাট বলে ওঠেন, لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِيْ لَيَمْلِكُنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَـــاتَيْنِ 'যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাক, তাহ'লে ওরা অবশ্যই আমার দু'পায়ের নীচের এই সিংহাসনটারও মালিক হয়ে যাবে' *(ইবনু জারীর, তারীখুত ত্বাবারী ২/২১৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭, ৫৪)*। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল এবং হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়েছিল।

শিক্ষা : মুসলমানেরা বীরের জাতি। তারা যদি ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহ'লে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

৯০. ক্বিয়ামতের সামান্য দৃশ্য

মানুষের জীবন-মৃত্যু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যার যতদিন হায়াত আছে সে পৃথিবীতে ততদিন বেঁচে থাকবে। আবার যার যেখানে যে অবস্থায় মৃত্যু লেখা আছে, তাকে সেখানে সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কোন কোন সময় মানুষের এমন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, যা বিবেকবান সকলের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে অনেকেই। নিজের অজান্তেই চোখের কোণা থেকে তপ্ত অশ্রুফোটা গড়িয়ে পড়ে অবিরত বর্ষণধারায়। ধৈর্য ধারণ করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও সবকিছু মেনে নিতে হয়। কিন্তু হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত হয় তা অমোচনীয় হয়েই থেকে যায়। কখনও ঐ ঘটনা স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলে ডুকরে কেঁদে ওঠে মন। এমনই একটি বিষয় তুলে ধরতে নিম্নের ঘটনাটির অবতারণা।

আমরা সাগর কূলের মানুষ। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা সহ্য করেই আমাদের বেঁচে থাকা। বিপদ মাথায় নিয়ে আমাদের পথ চলা। আমাদের বিপদ মুহূর্তের একটি হৃদয়বিদারক সত্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

আমি তখন যুবক ছিলাম। একদিন দেখি আকাশে খুব মেঘ। ভাবলাম ঝড় হ'তে পারে। পরিবারের সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলাম। সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি সাগরের দিক থেকে বিরাট জলোচ্ছ্বাস ৩৫-৪০ ফুটের বেশী উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। তখন ভাবলাম বাঁচার আর কোন উপায় নেই। সবাইকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ৭-৮ বছরের এক ছেলে আমার কাঁধে ছিল।

পানি এতো জোরে এসে ধাক্কা দিল যে, ছেলেটা ছাড়া আর সবাই হারিয়ে গেল। তখন আমরা অনেক পানির নিচে। পানি আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। যখন পানির উপরে উঠলাম তখন কোথাও কোন ঠাঁই নেই। কোথাও কোন গাছ বা উঁচু কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ছেলেটা তখনও কাঁধে। গলা ধরে আছে। ওকে বললাম, আব্বা! তুমি দু'হাতে আমার গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধর, ছেড় না যেন! তাহ'লে ডুবে যাবে। ছেলেটি কাঁদছে আর বলছে, আব্বা তুমি আমাকে ফেলে দিও না। তাহ'লে আমি কিন্তু ডুবে যাব। তখন আবার ঢেউ চলছে ২-৩ ফুট উঁচু হয়ে। আমরা সেই ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছি। পানি খেয়ে আবার উপরে উঠছি। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে আধা ঘণ্টার মত খুব কষ্টে সাঁতার কেটে বেঁচে আছি। কোথাও কোন ঠাঁই দেখা যায় না। তখন ভাবছি, আর বোধ হয় বাঁচতে পারব না। জীবন যায় যায় অবস্থা। মনে মনে ভাবছিলাম, ছেলেটা যদি গলা ছেড়ে ডুবে যেত তাহ'লে হয়তো নিজে বাঁচতাম। পরে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বলে দিলাম, তুই আমার গলা ছেড়ে দে। ছেলে তখন কেঁদে ফেলল। আর কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আব্বা! তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, আমি ডুবে যাব। বার বার বলার পরেও যখন ছেলেটি গলা ছাড়ছে না, তখন আমি হাত ধরে টান দিই। ছেলে আরো জোরে কাঁদে এবং জোরে গলা জড়িয়ে ধরে। আমরা দু'জনের কেউ মরতে চাই না, আবার কেউ বাঁচতেও পারছি না। (এমন পরিস্থিতিতে আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে একটু কল্পনা করুন তো, কেমন লাগে!)। এটা ছিল মৃত্যুর পূর্বের ভয়াবহ অবস্থা। ছেলের কান্নাতে আমার আর মায়া হ'ল না। আমি ওর হাত টেনে কামড়িয়ে ধরলে সে আমার গলা ছেড়ে দেয়। সাথে সাথে ছেলেটি ডুবে যায়। পানির অনেক নীচে চলে যায়। তখন মনে মনে বললাম, বেঁচে গেছি। এর মাত্র ৫ মিনিট পর আমার পায়ে উঁচু গাছের

ডাল লাগল। আমি তার উপরে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে ছেলেটির হৃদয় বিদীর্ণকারী কান্নাজড়িত কথা কানে ভেসে আসল। চোখে বাঁধভাঙ্গা অশ্রু নেমে এলো। তখন ভাবছি এই তো ঠাঁই পেলাম, তবে কেন আমার ছেলেটাকে পানিতে ফেলে দিলাম! একি করলাম আমি? এইটুকু সময় আমি তাকে ধরে রাখতে পারলাম না! কত বড় ভুল হয়ে গেল! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে জায়গাটাও বুঝতে পারছি। পানি সরে গেলে ওখানে লাশ পাওয়া যাবে। দেড়দিন পর পানি সরে গেল, আমি গাছে ছিলাম। একটু ক্ষুধাও লাগেনি, ঘুমও আসেনি। তারপর ছেলের লাশ সেখানে পেয়ে আরো কষ্ট হ'ল। যে কষ্ট আমি আজও ভুলতে পারছি না। আমার এখন কয়েকটা ছেলে-মেয়ে। বয়স ৬০ বছর। তবুও ঐ স্মৃতি আমাকে পাগল করে দেয়। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়ায় এ অবস্থা হ'লে ক্বিয়ামতের দিন কি অবস্থা হবে? যেখানে কোন দিন মরণ হবে না। কেউ কাউকে সাহায্য করবে না।

শিক্ষা : দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে যদি কলিজার টুকরা প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে ছুঁড়ে দিতে পারে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতায় মানুষ কি করবে সেটা চিন্তার বিষয়। যে দিবসের বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন ঐ বিকট ধ্বনি আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার নিজের ভাই হ'তে, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হ'তে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একই চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে' *(আবাসা ৩৩-৩৭)*। অতএব সচেতন মানুষ মাত্রেরই ঐ জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে সঠিক প্রস্তুতি তথা সৎ আমল করতে না পারলে পরকালীন জীবনে কোন আপনজন কাজে আসবে না। বরং সেদিন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। একান্ত আপনজনও পরিচয় দিবে না। ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

উপদেশবাণী

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, দশটি বস্তু ফলহীন, যা কোন কাজে লাগে না।

(১) ঐ ইল্‌ম, যে মোতাবেক আমল করা হয় না।

(২) ঐ আমল, যার মধ্যে ইখলাছ নেই।

(৩) ঐ মাল, যা (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করা হয় না।

(৪) ঐ অন্তর, যা আল্লাহ্‌র ভালবাসা হ'তে খালি।

(৫) ঐ দেহ, যা আল্লাহ্‌র আনুগত্য হ'তে মুক্ত।

(৬) ঐ ভালবাসা, যা তার প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে আগ্রহী নয়।

(৭) ঐ সময়, যা ত্রুটি সংশোধন ও নেকী অর্জন হ'তে শূন্য।

(৮) ঐ চিন্তাধারা, যা অনুপকারী কাজে ব্যাপৃত থাকে।

(৯) ঐ খিদমত, যা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে না বা দুনিয়াতেও কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

(১০) ভয় করা ঐ বস্তুকে বা আকাংখা করা ঐ বস্তুর নিকটে, যে নিজে আল্লাহ্‌র হাতের মুঠির মধ্যে বন্দী'।

তিনি বলেন, ক্রোধ হল হিংস্র পশুর মত, যখন মানুষ ক্রোধের অবস্থা থেকে বিরতি নেয় তখন ক্রোধ তাকেই ভক্ষণ করতে শুরু করে। আর কুপ্রবৃত্তি হ'ল আগুনের মত, যখন কেউ তা প্রজ্জ্বলিত করে তখন সে তাকেই পুড়ানো শুরু করে। অহংকার হ'ল রাজার কাছে তার রাজত্ব নিয়ে বচসায় লিপ্ত হওয়ার মত, যদি রাজা তোমাকে ধ্বংস নাও করে, তবে নিশ্চিতভাবে বিতাড়িত করবে। আর হিংসা হ'ল নিজের চাইতে শক্তিশালী কারো সাথে মুকাবিলা করার মত। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তি ও ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকে, শয়তান তার ছায়াও মাড়ায় না। আর যে ব্যক্তির উপর প্রবৃত্তি ও ক্রোধ বিজয়ী হয়েছে, শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায় (অর্থাৎ এই ভয়ে যে কখন তার উপর গযব নাযিল হয়)' *(আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১/১৭২)*।

উত্তম বন্ধুর পরিচয়

১. যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. তার পাশে বসলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৩. তার সাথে কথা বললে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

৪. তার কাজ-কর্ম দেখলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়।

জীবনে যা প্রয়োজন

সবচেয়ে স্বার্থপর ১ অক্ষরের শব্দ- 'I' (আমি)
একে ত্যাগ করুন

সবচেয়ে পরিতুষ্টি ও সম্প্রীতিকর ২ অক্ষরের শব্দ- 'We' (আমরা)
একে ব্যবহার করুন

সবচেয়ে বিষাক্ত ৩ অক্ষরের শব্দ- 'Ego' (আত্মঅহমিকা)
একে ধ্বংস করুন

সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ৫ অক্ষরের শব্দ- 'Smile' (মুচকিহাসি)
একে ধরে রাখুন

সর্বাধিক দ্রুত বিস্তৃতি লাভকারী ৬ অক্ষরের শব্দ- 'Rumour' (গুজব)
একে এড়িয়ে চলুন

সর্বাধিক পরিশ্রমনির্ভর ৭ অক্ষরের শব্দ- 'Success' (সাফল্য)
এটি অর্জনে ব্রতী হউন

সর্বাধিক হিংসাত্মক ৮ অক্ষরের শব্দ- 'Jealousy' (ঈর্ষা)
এটি থেকে দূরে থাকুন

সর্বাধিক শক্তিশালী ৯ অক্ষরের শব্দ- 'Knowledge' (জ্ঞান)
একে অর্জন করুন

সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ১০ অক্ষরের শব্দ- 'Confidence' (আত্মবিশ্বাস)
এটির ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হউন।